অন্ধকারে একা

রোকসানা নাজনীন

প্রথম খণ্ড

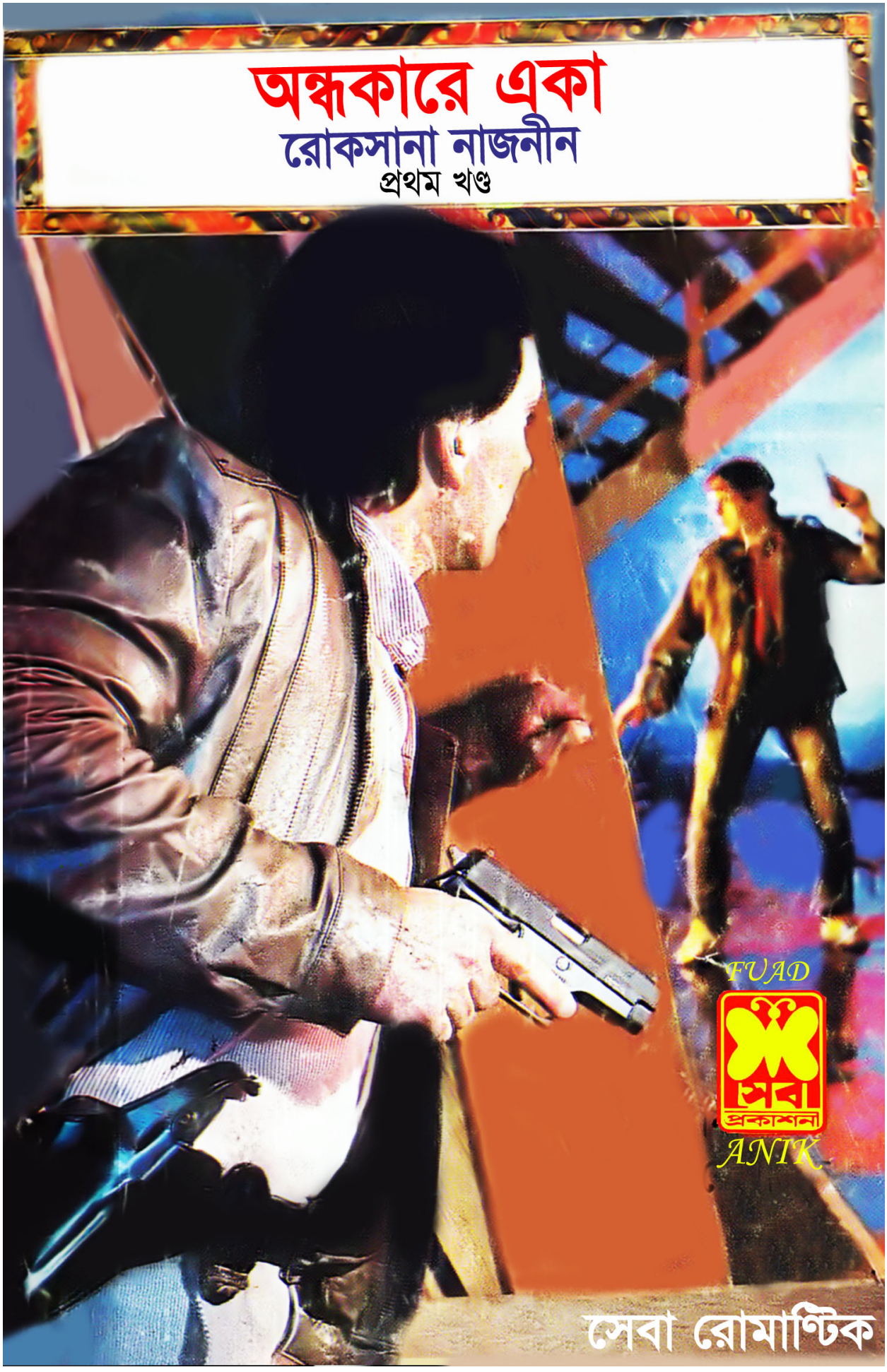

FUAD

সেবা প্রকাশনী

ANIK

সেবা রোমান্টিক

রোমান্টিক

অন্ধকারে একা

রোকসানা নাজনীন

মারাত্মক ভাবে আহত এক যুবককে জেলেরা উদ্ধার করল সাগর থেকে। পৌঁছে দিল ছোট্ট একটা দ্বীপে। শারীরিক ভাবে সুস্থ হলো সে কিন্তু স্মরণশক্তি পুরোপুরিই হারিয়েছে। নিজের নাম-পরিচয় কিছুই জানে না। ডাক্তার ওকে জানাল, ওর নিতম্বে একটা নেগেটিভ ইমপ্ল্যান্ট করা ছিল—যাতে জুরিখের একটা ব্যাঙ্কের ঠিকানা আর অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে। ব্যাঙ্কে রয়েছে কয়েক মিলিয়ন ডলার। নাম্বারগুলো দেখিয়ে অনায়াসে তা তুলে নিল যুবক। কিন্তু ওর পেছনে লেগে গেল ভয়ঙ্কর সব লোক। তাড়া খেয়ে ছুটছে যুবক। শুধু একটি মেয়ে তার মঙ্গল চায়। কোথায় গিয়ে এর শেষ!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

অন্ধকারে একা

রোকসানা নাজনীন

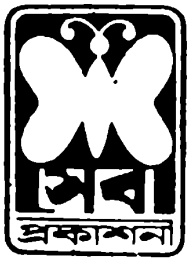

সেবা প্রকাশনী

'সেবা রোমান্টিক'-এর ক'টি বই

খন্দকার মজহারুল করিম

সেই চোখ, তোমার জন্যে, জানিনা কখন, আমরা দুজনে, চন্দনের বনে, নও শুধু ছবি, সোনালী গরল, অনুরূপা, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা, দূর আকাশের তারা, অরণ্যের গান ১ ও ২, অতল জলের আহ্বান, একটি মাধবী, হাতে রাখো হাত, একটুখানি চাওয়া, ছায়া ঘনায়, বর্ষারাতের শেষে, ময়ূরী রাত, নীল ধ্রুবতারা, ফাগুনের ফুল।

রোকসানা নাজনীন

বন্দী অপ্সরা, ফিরিয়ে দাও ১, ২।

বাবুল আলম

স্বপ্ন নিয়ে, লাল রিবন, সংশয়।

মোস্তাফিজুর রহমান

ছলনাময়ী।

বিশু চৌধুরী

অচেনা পরবাসী।

খসরু চৌধুরী

তবু অচেনা।

শেখ আবদুল হাকিম

নগ্ন প্রাচীর ১ ও ২, সে আমার, একা আমি, অন্তরা।

শাহরিয়ার শামস

স্বপ্নের অপরাহ্ণ।

এক

রাতের আঁধার কেটে ধুঁকতে ধুঁকতে এগুচ্ছে ট্রলারটা। প্রতি মুহূর্তে ডেকে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের মত উঁচু সব ঢেউ, ফোয়ারার মত ছিটকে ওঠা বিন্দু বিন্দু জলে ঢাকা পড়ছে ওপরের আকাশ। বাতাসের গর্জন ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছে কাঠের ঘর্ষণের বিকট আর্তনাদ। টান টান হয়ে আছে রশিগুলো, যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে। ডুবছে ট্রলার।

সব গোলমাল ছাপিয়ে পর পর দু'বার গুলির শব্দ হল। অনুজ্জ্বল হলদেটে আলো জ্বলছে কেবিনের জানালায়, ট্রলারের সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সরসর করে উঠে যাচ্ছে অনেক ওপরে, পরমুহূর্তেই বিপুল গতিতে নেমে আসছে সাগরের বুকে। গুলির শব্দ এসেছে কেবিনের ভেতর থেকে। এক হাতে পেট অন্য হাতে রেলিং চেপে ধরে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না লোকটা আহত।

কেবিনের দরজায় দেখা গেল দ্বিতীয়জনকে। বাঁ হাতে দরজার ফ্রেম আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে, ডান হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। আরও দু'বার গুলি করল সে।

চতুর্থ গুলি খাবার পর সামনের লোকটা রেলিঙ ছেড়ে দু'হাত উঁচু

করে পেছন দিকে হেলে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রলারের বো দুটো বিশাল ঢেউয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকে আছড়ে পড়ল। ভারসাম্য হারিয়ে আহত লোকটা পড়ে গেল কাঠের মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রলারের নাক পানি কেটে ওপর দিকে উঠতে থাকল। কেবিনের দরজায় দাঁড়ানো আক্রমণকারী কেবিনের ভেতরে গড়িয়ে গেল। কিন্তু তার আগেই আর একবার ট্রিগার টানার সময় পেয়েছে সে। চিৎকার করে উঠল আহত জন। লোনা জলের ছিটে আর গরম রক্তের স্রোতের জন্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিছু একটা আঁকড়ে ধরার আশায় অন্ধের মত চারপাশে হাতড়াচ্ছে। ধরার মত কিছুই ছিল না, ফলে ট্রলারটা একদিকে কাত হতেই সর্বাঙ্গে বুলেটের আঘাত নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল লোকটা নিচের অন্ধকারে।

বরফের মত ঠাণ্ডা পানি মুহূর্তে অসাড় করে দিল শরীরের প্রতিটা মাংসপেশী। উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে, পরমুহূর্তেই ডুবে যাচ্ছে কয়েক টন পানির তলায়। যে দু'এক সেকেন্ডের জন্যে ভেসে উঠছে, তার মধ্যেই প্রাণপণে পৃথিবীর সবটুকু বাতাস টেনে নেবার চেষ্টা করছে ক্ষতবিক্ষত ফুসফুস দুটো। মনে হচ্ছে কেউ যেন বরফের ছুরি দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে বুক, পেট আর উরু। মাথার তালুতে ভেজা আর উষ্ণ এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ছে প্রতিরোধ শক্তি, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে আহত শরীরটা। গভীর ঘুমে বুজে আসছে দু'চোখ।

হঠাৎ করেই ঘোরটা কেটে গেল, প্রাণপণে পানির ওপরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করল সে। না! এত সহজে হার মানা যাবে না। বাঁচতে

হবে, যে করেই হোক বেঁচে থাকতে হবে!

দু'পায়ে লাথি মারছে, দু'হাতের মুঠিতে খামচে ধরার চেষ্টা করছে চারপাশের পানির দেয়াল, অক্সিজেনের অভাবে ফেটে পড়তে চাইছে ফুসফুস। মাথাটা ভেসে উঠতেই মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল, প্রাণপণে শরীরটা পানির ওপরে তুলে আনার চেষ্টা করল।

বিশাল একটা ঢেউ এল গড়িয়ে গড়িয়ে। একরাশ সাদা ফেনার সঙ্গে সঙ্গে সেও ঢেউয়ের মাথায় চড়ে উঠে গেল অনেকটা ওপরে।

বিস্ফোরণটা হল তক্ষুণি। কানে তালা ধরানো ভয়ানক শব্দটা ইথারে ভেসে খোলা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল অনেকদূর। লালচে আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাতের আকাশ, বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে ট্রলারের ভগ্নাংশ।

নিশ্চিন্ত হল সে।

আবার তলিয়ে যেতে শুরু করল, কেউ যেন পা ধরে টানছে নিচের দিকে। কাঁধের ওপর আছড়ে পড়ছে বিক্ষুব্ধ জলরাশী, আবার ঝিমিয়ে পড়তে চাইছে শরীরের প্রতিটা রোমকূপ।

হঠাৎ করেই বুকের ওপর কিছু একটা আঘাত করল। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল সে, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবার আলোড়ন শুরু হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় অন্ধের মত হাত-পা ছুঁড়ল লোকটা, শক্ত মত কিছুতে ঠুকে গেল ডান হাতের মুঠি। নিজের অজান্তেই দু'হাতে আঁকড়ে ধরল লম্বা কাঠের টুকরোটা, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও একটা ট্রলারের অংশ ছিল সেটা। জিনিসটা কি সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই ওর, পরম নির্ভরতায় জড়িয়ে ধরে আছে। গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে এখন আর কোন বাধা নেই।

পুবের আকাশে কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে ভোরের সোনালী আলো গড়িয়ে

পড়েছে মেডিটেরেনিয়ানের কোলে, সোনার মত ঝকঝক করছে শান্ত জলরাশী। ছোট্ট মাছধরা বোটের স্কিপার সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে সাগরের সমাহিত সৌন্দর্য উপভোগ করছে। ঠোঁটে ঝুলছে হাতে বানানো বিড়ি, রাতের পরিশ্রমে চোখ দুটো লাল, অনবরত রশির ঘর্ষণে ছিলে গেছে দু'হাতের তালুর চামড়া, রোদে জ্বলা তামাটে মুখে, এ মুহূর্তে দুর্ভাবনা বা বিরক্তির চিহ্ন নেই। স্টার্ন-গানেলে বসে থেকেই খোলা হুইল হাউসের দিকে ফিরল স্কিপার। ছোট ভাইটা থ্রট্‌লে বসে আছে, তার কয়েক ফুট পেছনে বসে একটা মাছ ধরা জাল পরীক্ষা করে দেখছে ওর একমাত্র সহকারী। হাসি-ঠাট্টায় মেতে আছে ছেলে দুটো। কি নিয়ে এত হাসাহাসি করছে ওরা? গত রাতের ঝড় নিয়ে নয় নিশ্চয়ই। হঠাৎ করে ওরকম ঝড়ই বা এল কোত্থেকে? মার্সেইয়ের আবহাওয়া-বার্তায় তো সেরকম কোন উল্লেখই ছিল না। আগে থেকে জানলে নাহয় রাতটা কোস্টলাইনের কোন শেলটারে কাটানো যেত। সত্তর কিলোমিটার দূরে মাছে কিলবিল করছে সাগরের লোনা জল, সূর্য ওঠার আগে ওখানে পৌঁছানো দরকার ছিল ঠিকই, কিন্তু ঝড়ের আশঙ্কা থাকলে কে যেত! এখন ভাঙাচোরা বোটটাকে মেরামত করতে এক কাঁড়ি পয়সা বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া বেশ ক'বার পিতৃদত্ত জানটাও যেতে বসেছিল। শা-লা!

'খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' থ্রট্‌ল থেকে চেঁচিয়ে বলল ছোট ভাইটা, 'যাও না, একটু বিশ্রাম নাও গে।'

'হুঁ,' হাতের বিড়িটা সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গানেল থেকে পিছলে ডেকে রাখা একরাশ ভেজা জালের ওপর নেমে দাঁড়াল স্কিপার। 'দেখি একটু ঘুমাতে পারি কিনা।'

নিজের ভাই থ্রট্‌লের দায়িত্বে রয়েছে বলে নিশ্চিন্ত বোধ করল

স্কিপার। যদিও ছেলেটা পেশা হিসেবে কখনোই সমুদ্রে মাছ ধরে বেড়াবে না। পরিবারের মধ্যে সে-ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, এর মধ্যেই বেশ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা শিখে গেছে। ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে এসে ভাইকে সাহায্য করছে। অবশ্য পারিবারিক পেশা না নেওয়াতে ছোট ভাইটির ওপর ওর কোন রাগ নেই, বরং পড়াশুনা করে ভদ্রলোক হচ্ছে বলে ভাইয়ের জন্যে চাপা গর্ব অনুভব করে।

'আরে! কি ওটা?'

ভাইয়ের চিৎকারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুজে আসা চোখের পাতা দুটো খুলতে হল।

'কি? কি হয়েছে?' চ্যাঁচাল স্কিপার।

'পোর্ট বো!' উত্তেজনায় কাঁপছে ছেলেটার গলা, 'একটা মানুষ! প্ল্যাঙ্ক আঁকড়ে ধরে ভেসে আছে!'

দ্রুত দৌড়ে এসে হুইলের দায়িত্ব নিল স্কিপার। ডানদিকে বোট ঘোরাল সে যেদিকে ভাসছে দেহটা, আগেই কমিয়ে দিয়েছে ইঞ্জিনের গতি যাতে ঢেউ না ওঠে। মনে হচ্ছে একটু দোলা লাগলেই দেহটা প্ল্যাঙ্কের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবে। কাঠের প্ল্যাঙ্কের দু'কিনারা আঁকড়ে ধরা হাতের মুঠি দুটো কাগজের মত সাদা, দেহে প্রাণ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

কোমরে রশি জড়িয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল ছেলেটা, ডেকের ওপর থেকে পাকানো রশি ছাড়ছে বাকি জন।

'রশির আগায় লুপ বাঁধো,' ভাইয়ের উদ্দেশ্যে চেঁচাল স্কিপার, 'পায়ের তলা দিয়ে লুপটা ধীরে ধীরে কোমর পর্যন্ত নিয়ে এসো। সাবধান! হ্যাঁ...এবার আস্তে আস্তে নামিয়ে আনো দেহটা।'

'ইতিমধ্যে ডেক থেকে স্কিপারের সহকারীও সাগরে নেমে পড়েছে

ওকে সাহায্য করার জন্যে।

'কি হল?' ওদের দেরি দেখে জানতে চাইল স্কিপার।

'মুঠো দুটো প্ল্যাঙ্ক থেকে ছাড়াতে পারছি না!'

'মরে গিয়ে শক্ত হয়ে গেছে বোধহয়। আঙুলের ডগার তলা দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করো।'

'না না! বেঁচে আছে মনে হয়!' নবউদ্যমে প্ল্যাঙ্ক থেকে দেহটা নামাবার চেষ্টা করছে ছেলেটা। 'বোটটা একটু নড়ে উঠল যেন। কিন্তু শ্বাস নিচ্ছে না। আরে! লোকটা চেয়ে আছে আমার দিকে! মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে সবকিছু!'

'হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়েছি,' চেঁচিয়ে উঠল স্কিপারের সহকারী ছেলেটা।

'কাঁধের নিচে হাত দিয়ে পানিতে নামিয়ে আনো, খুব সাবধান!' ওপর থেকে নির্দেশ দিচ্ছে স্কিপার।

'হায় ঈশ্বর!' ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ছোট ভাইটা, 'লোকটার মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়ে আছে!'

'ঝড়ের মধ্যে প্ল্যাঙ্কে বাড়ি খেয়েই মাথাটা ফাটিয়েছে,' মতামত দিল অন্যজন।

'না,' ওপর থেকে ঝুঁকে ক্ষতস্থানটা দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল স্কিপার। 'পরিষ্কার লম্বা ক্ষত। বুলেটের চিহ্ন। কেউ গুলি করেছে লোকটাকে।'

তিনজনে মিলে দেহটাকে ডেকে তুলে আনতে তেমন ঝামেলা হল না।

'তুমি কি নিশ্চিত ক্ষতটা বুলেটের?' ভাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল ছেলেটা।

'অবশ্যই।' মনোযোগ দিয়ে দেহটা পরীক্ষা করছে স্কিপার, 'শুধু মাথায় নয়, শরীরেও গুলি খেয়েছে লোকটা। পোর্ট নোয়া দ্বীপে যেতে হবে আমাদেরকে। ওটাই সবচেয়ে কাছের গ্রাম। একজন ডাক্তার আছে ওই দ্বীপে।'

'ইংরেজ লোকটা?'

'চিকিৎসা তো করে!'

'যখন সুস্থ থাকে, শুধু তখনই রোগী দেখে,' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বড় ভাইয়ের যুক্তি খণ্ডাতে চাইল সে, মাসের মধ্যে পনেরো দিনই মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। মানুষের চেয়ে ভেড়ার চিকিৎসাতেই ওর হাতযশ বেশি।'

'এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি করব? পোর্ট নোয়ায় পৌঁছানো পর্যন্ত বেঁচে থাকবে বলেও তো মনে হচ্ছে না। যদি বেঁচে থাকে তবে অতিরিক্ত পেট্রলের খরচটা একসময় ঠিকই উশুল করে নেব। বাক্সটা নিচ থেকে নিয়ে এসো তো, একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দেই—যদি এতে কিছু উপকার হয়!' ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্কিপার।

মাছধরা নৌকাগুলো একে একে তীরে ভিড়তে শুরু করেছে। ত্রাহি চিৎকার জুড়েছে কয়েক শো সী-গাল, তার সঙ্গে সমুদ্র ফেরত জেলেদের কলরব মিশে রীতিমত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। বেলা পড়ে এসেছে, পশ্চিমাকাশে সূর্যটাকে দেখাচ্ছে আগুনের গোলার মত। দিনের শেষে তাপমাত্রা নেমে আসছে, অস্বস্তিকর আর্দ্র বাতাসে মেছো গন্ধ। জেটির কাঠের পাটাতনগুলো ঘেঁষে কোব্‌লস্টোনের তৈরি গ্রামের সবচেয়ে ব্যস্ত সড়ক। দু'ধারে নোনা ধরা পুরানো কয়েকটা বাড়ি, বালু মেশানো শুকনো মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলেছে অল্প কিছু আগাছা। জেটির

আশেপাশের বাড়ি ক'টায় খাবার আর মদের দোকান, গুটি কতক দোকানপাটও আছে। এর পরেই শুরু হয়েছে আবাসিক এলাকা। এই বাড়িগুলোও জীর্ণশীর্ণ রঙচটা, ছিরিছাঁদের বালাই নেই। তবুও জানালায় ঝোলানো সাদা লেসের পর্দা আর সামনের রেলিঙ ঘেরা ছোট্ট বারান্দার জন্যে বাড়িগুলোকে দোকানপাট আর শুঁড়িখানা থেকে আলাদা করে চেনা যায়।

সাগরের দিকে মুখ করা সবশেষের ছোট্ট বাড়িটারই সবচেয়ে জরাজীর্ণ অবস্থা, একটু বাতাসেই ভেঙে পড়বে বলে মনে হয়। অথচ বছরের পর বছর ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করে টিকে আছে আজও। বাড়িটার মালিক একজন ইংরেজ ডাক্তার, আট বছর আগে পোর্ট নোয়ায় এসে আস্তানা গেড়েছেন। বিদেশী একজন ডাক্তার সভ্যতার সংস্পর্শবিহীন ছোট্ট এই দ্বীপে কেন বসবাস করছেন সে সম্পর্কে দ্বীপবাসী জেলেরা কোন কৌতূহল বোধ করেনি। একজন আস্ত ডাক্তার ওদের প্রতিবেশী এতেই তারা খুশি। যদিও লোকটা যতটা না ডাক্তার তার চেয়ে বেশি মাতাল। ডাক্তারকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তবে দ্বীপের বাসিন্দা শ'খানেক জেলে এবং তাদের পরিবার পরিজন সকলেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ডাক্তারের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই। সামান্য কাটা-ছেঁড়া আর সর্দি-গর্মির চিকিৎসা মাতাল অবস্থাতেও তিনি ভালই পারেন।

অন্যান্য রোববার সকালের তুলনায় ডাক্তারের কুটিরে বড় বেশি নির্জনতা বিরাজ করছে আজ। সবাই জানে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ডাক্তার মদের বোতল হাতে রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা হল্লা করে বেড়ান। তারপর রাত একটু বাড়লে রাস্তা থেকে যে কোন এক বারবনিতাকে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। রোববার সকালেও

যথারীতি মাতাল অবস্থায় বারান্দায় বসে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। তবে গত কয়েক শনিবার ধরে এই নিয়মের ব্যাঘাত ঘটছে। সত্যি বলতে কি গত কয়েক সপ্তায় গ্রামের কোথাও ডাক্তারকে দেখা যায়নি। তবে প্রতিবেশীরা সেজন্যে উদ্বিগ্ন নয়। শুঁড়িখানা থেকে নিয়মিত মদের বোতল পাঠানো হয়েছে ডাক্তারের বাড়িতে, তারমানে ডাক্তার ভালই আছেন, কোন বিপদ হয়নি। বেশ ক'দিন আগে কয়েকজন জেলে মৃতপ্রায় অচেনা এক লোকের দেহ সাগর থেকে তুলে এনে ডাক্তারের কাছে রেখে গেছে, এরপর থেকে কেউ ডাক্তারকে ঘর থেকে বেরুতে দেখেনি।

তন্দ্রা ভেঙে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন ডক্টর ক্লিফর্ড টুক্সবেরী। চোখ মিটমিট করে তন্দ্রার ঘোরটা কাটাবার চেষ্টা করতে করতে শোবার ঘরের খোলা দরজায় উঁকি দিলেন চেয়ারে বসে থেকেই। হঠাৎ করে ঘুমটা ভাঙল কেন? রোগী কি আবার প্রলাপ বকতে শুরু করেছে? নাহ্...কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না ওঘর থেকে। আজ ধর্মীয় উপাসনার দিন, সী-গালদের বিরক্ত করার জন্যে জেটিতে কোন নৌকা ভিড়ছে না। তাই পাখিগুলোও একদম চুপ। মনে হচ্ছে যেন পুরো দ্বীপটা ঘুমিয়ে আছে।

পাশের ছোট্ট টেবিলে রাখা খালি গ্লাস আর আধভরা হুইস্কির বোতলটার দিকে চাইলেন ডক্টর টুক্সবেরী। উন্নতির লক্ষণ। সাধারণত রোববার সকালে এই সময়ের মধ্যে পুরো বোতল খালি হয়ে যায় প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মার্সেই থেকে ছোট বোনটার পাঠানো চারটা স্কচের বোতলের জন্যে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করে থাকেন তিনি। বর্তমান জীবনযাত্রায় এটাই ডাক্তারের একমাত্র বিলাসিতা।

যদিও ইচ্ছে করলে সে আরও অনেক বেশি কিছু করতে পারে, সে সামর্থ্য তাঁর আছে, কিন্তু ডক্টর টুক্সবেরী এতেই কৃতজ্ঞ। যদি কোন কারণে বোনের কাছ থেকে নিয়মিত পাওয়া এই ছোট্ট উপহার আর না আসে, তবে শুঁড়িখানার হাতে বানানো সস্তা অখাদ্য মদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। এই নিঃসঙ্গ অকর্মণ্য জীবনে মদ ছাড়া আর আছেই বা কি!

অবশ্য প্রায় চার সপ্তাহ আগে কয়েকজন জেলে নাম-না-জানা অর্ধমৃত লোকটাকে নিয়ে আসার পর থেকে ডাক্তারের একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য এসেছে। জেলেরা নিজেদের নাম-ঠিকানা রেখে যায়নি। ওরা গুলি খাওয়া লোকটার উপকারই করতে চেয়েছে, সে ব্যাপারে কোনরকম আদিখ্যেতা করতে চায়নি।

তবে উপকারী জেলেরা জানত না যে বুলেট শুধু লোকটার দেহেরই ক্ষতি করেনি, আহত করেছে মনটাকেও।

চেয়ার ছেড়ে টালমাটাল পায়ে জানালায় এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে তরল রূপোর মত সাগর। চোখ কুঁচকে পর্দাটা একটু নামিয়ে দিলেন। ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করলেন সামনের রাস্তাটা। ঘোড়ায় টানা একটা ছ্যাকড়া গাড়ি আসছে গ্রামের দিক থেকে, কোন জেলে-পরিবার রবিবাসরীয় ভ্রমণে বের হয়েছে। হঠাৎ করেই লন্ডনের কথা মনে পড়ে গেল। গ্রীষ্মের উষ্ণ মাসগুলোতে রিজেন্ট পার্কে ট্যুরিস্টরা এভাবেই হাওয়া খেতে বের হয়, কারুকাজ করা ভেলভেটে মোড়া ক্যারেজগুলো টানে সবল সুসজ্জিত গেল্ডিঙের দল। নিজের অজান্তেই হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার, কার সঙ্গে কার তুলনা! পরক্ষণেই ভার হয়ে এল বুকের ভেতরটা, এ জীবনে আর কি লন্ডনে ফেরা যাবে?

রোগীর জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় আছেন ডক্টর টুক্সবেরী। বুক, পেট

আর পায়ের প্রতিটা ক্ষতই মারাত্মক। বুলেটগুলো শরীর থেকে বেরিয়ে যায়নি, তারপর সাগরের লোনা জল ক্রমাগত ধুয়ে দিয়েছে ক্ষতগুলোকে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা, সম্ভবত ওই দুটো কারণেই লোকটা এরপরেও বেঁচে ছিল। তবে মাথার ক্ষতটাই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। বুলেট যে শুধু গভীরে ঢুকেছে তাই নয়, হাইপোক্যাম্পাস ফাইব্রস-রিজিয়ন আর থ্যালামাসেও চাপ ফেলেছে। বুলেটটা দু'এক মিলিমিটার এদিক-ওদিক বিদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত লোকটা। যদিও ছিন্নভিন্ন শরীরটায় প্রাণের চিহ্ন খুব কমই ছিল। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় ডক্টর টুক্সবেরীকে। তিনি একজন ডাক্তার, সম্ভবপর সব ধরনের চেষ্টাই চালাতে হবে তাঁকে। পরবর্তী ছত্রিশ ঘণ্টা এক ফোঁটা মদ স্পর্শ করেননি ডাক্তার, শুধু পানি আর শ্বেতসার জাতীয় খাবার খেয়েছেন প্রচুর পরিমাণে। তারপর বহু বছর পর সূক্ষ্ম এবং অতি বিপদজনক অস্ত্রোপচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, লন্ডনের ম্যাকলিন হসপিটাল থেকে বরখাস্ত হবার পর থেকে এ ধরনের সার্জারি করতে হয়নি তাঁকে। দক্ষ শিল্পীর মত মগজের আঘাতপ্রাপ্ত ফাইব্রস অংশের প্রতি মিলিমিটার জায়গা পরিষ্কার করতে হয়েছে অসীম ধৈর্য সহকারে, তারপরে ক্রেনিয়াল-উন্ডের ওপরের চামড়া টেনে এনে সেলাই করতে হয়েছে। সুঁইয়ের একটুখানি খোঁচা কিংবা হাতের অল্প একটু কাঁপনই রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারত, সেজন্যেই ডাক্তার অস্ত্রোপচারের আগে সময় নিয়ে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন।

অপারেশনের পর বিপদজনক সময়টুকু পার হয়ে যাবার পরে রোগীর অবস্থা যখন মোটামুটি ভালর দিকে, ডাক্তার আবার টেনে নিয়েছিলেন মদের বোতল। তবে মাতাল হয়েছেন ঠিকই কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও চেতনা হারাননি। এটাও একটা উন্নতির লক্ষণ।

অপেক্ষা করছেন ডক্টর টুক্সবেরী।

কথা ফুটল প্রথমে। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের মত ঘরময় শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল অস্ফুট বাক্য দুটো।

'কে ওখানে? কে আপনি?'

খুব ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর টুক্সবেরী। সাবধানে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। কোন কর্কশ শব্দ করা চলবে না। পরের কয়েকটা মুহূর্ত অপারেশনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আচমকা জোরে শব্দ করলে রোগীর নার্ভে চাপ পড়তে পারে, যার ফলে স্থায়ী কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

'একজন বন্ধু,' খুব নিচু স্বরে বললেন ডাক্তার, পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'বন্ধু!'

'তুমি ইংরেজিতে কথা বলছ। আমিও তাই আশা করছিলাম। হয় আমেরিকান, নাহয় কেনেডিয়ান—যতদূর মনে হয়। তোমার দাঁতে যে ধরনের কাজ করা হয়েছে তা প্যারিস বা ইংল্যান্ডের ডেন্টিস্টরা করে না। তা কেমন আছ তুমি? শরীর ভাল তো?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'একটু সময় লাগবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। তবে চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু দরকার হলে আমাকে বলো। প্রকৃতির ডাক শুনতে পাচ্ছ কি?'

'কি?'

'বাথরুম করবে কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি। তোমার ডানদিকে সাদা পাত্রটা রাখা আছে ওই কর্মটি করার জন্যে।'

'দুঃখিত,' লজ্জা পেল সদ্য জ্ঞান ফেরা রোগী।

'দুঃখিত হবার কিছু নেই। ওটা আমরা সবাই করি, খুবই সাধারণ এবং স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়া। আমি একজন ডাক্তার, তোমার ডাক্তার। আমার নাম ক্লিফর্ড টুক্সবেরী। তোমার নাম?'

'কি?'

'তোমার নাম জানতে চাইছি।'

সাদা দেয়ালে সূর্যের সোনালী আলো নারকেল পাতার মত সরু সরু রেখায় প্রতিফলিত হচ্ছে, আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল রোগী। তারপর সরাসরি ডাক্তারের চোখে চোখ রেখে অসহায়ভাবে বলল, 'আমি জানি না।'

'ওহ্, মাই গড!'

'তোমাকে বহুবার বলেছি ধৈর্য ধরো, তাড়াহুড়ো করো না। এসব ব্যাপার জটিল, সময় সাপেক্ষ। নিজের সঙ্গে যতই যুদ্ধ করবে, ক্ষতি বাড়বে বই কমবে না,' নিজের চেয়ারে বসে আছেন ডাক্তার, হাতের গ্লাসে সোনালী পানীয়।

'আপনি মাতাল হয়ে গেছেন।' মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে আছে রোগী। এ ক'দিনে হেঁটেচলে বেড়াবার মত শক্তি সঞ্চয় করেছে।

'মাতাল হয়েছি, কিন্তু বিচার বুদ্ধি হারাইনি। এটাই আমার বৈশিষ্ট্য। মাতাল অবস্থাতেও টনটনে জ্ঞান থাকে। তবে তুমি যদি মন দিয়ে শোনো তবে কয়েকটা তথ্য দিতে পারি।'

'আমি শুনছি।'

'না, তুমি শোনো না। নিজের চারদিকে অদৃশ্য একটা দেয়াল তুলে দিয়েছ তুমি, ভেতরে ভেতরে নিজের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার করে

যাচ্ছ। আমার কোন কথাই শোনো না তুমি।'

'আমি শুনছি, ডাক্তার।'

'যে ক'টা দিন তুমি কোমাতে ছিলে, তিনটে ভাষায় প্রলাপ বকেছ। ইংরেজিতে, ফরাসী আর দুর্বোধ্য কোন এক ভাষা। সম্ভবত প্রাচ্য দেশীয় ভাষা সেটা। তারমানে বেশ কয়েকটা ভাষায় কথা বলতে পারো তুমি। আচ্ছা, কোন্ ভাষায় কথা বলতে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো?'

'অবশ্যই ইংরেজি।'

'আমরা আগেই সেটা জেনেছি। আচ্ছা, বলো তো কোন ভাষায় কথা বলতে অস্বস্তি হয়?'

'আমি জানি না। ঠিক কি জানতে চাইছেন আপনি?'

'যা কিছু মনে আসে, যে কোন কিছু।'

'আপনি মাতাল হয়ে গেছেন।'

'ও ব্যাপারেও আমরা আগেই একমত হয়ে গেছি, তাই না? আমি একজন ডাক্তার, মাতাল হই আর না হই, ভুলে যেয়ো না—তোমার জীবন রক্ষা করেছি। সত্যি বলতে কি, একসময় আমি খুব ভাল ডাক্তারই ছিলাম।'

'কি হয়েছিল?'

'রোগী কখনও ডাক্তারকে প্রশ্ন করে?'

'কেন নয়?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডক্টর টুক্সবেরী, দু'চোখ জানালার বাইরে ঝকমকে সাগরে নিবদ্ধ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হঠাৎ করেই অ্যালকোহলিক হয়ে পড়েছিলাম। মাতাল অবস্থায় অপারেশন করতে গিয়ে দু'জন রোগীকে মেরে ফেলি। একজন হলে ধামাচাপা দেয়া যেত।

কিন্তু দু'জন! আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল। অবশ্য ওরা ঠিকই করেছিল, একজন মাতাল ডাক্তারের হাতে ছুরি দেয়া মানে খুনের সহযোগিতা করা।'

'খুব কি প্রয়োজন ছিল?'

'প্রয়োজন! কিসের প্রয়োজন?'

'বোতলের।'

'ওহ্! অবশ্যই ছিল, এখনও সেটা ছাড়া চলে না আমার,' সাগর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রোগীর দিকে সরাসরি চাইলেন, 'ডাক্তারের সমালোচনা করা রোগীর উচিত নয়।'

'দুঃখিত।'

'বার বার ক্ষমা চাওয়ার বিরক্তিকর একটা স্বভাব আছে তোমার। বড় অদ্ভুত! তোমার প্রকৃতির সঙ্গে একটুও মেলে না। তোমাকে কখনোই খুব একটা নম্র-ভদ্র ছেলে বলে মনে হয়নি।'

'তার মানে আমি যতটুকু জানি আপনি তারচেয়ে বেশি জানেন।'

'তোমার সম্পর্কে অবশ্যই তোমার চেয়ে বেশি জানি। তবে পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন, প্রতিটা তথ্যই পরস্পরবিরোধী।'

সোজা হয়ে বসল রোগী। বোতাম খোলা শার্ট দু'পাশে সরে যাওয়াতে বুকের ব্যান্ডেজটা দেখা গেল। হাত দুটো ভাঁজ করতে শক্তিশালী মাংসপেশীতে কিলবিল করে উঠল শিরা-উপশিরা। 'আমাকে যতটুকু বলেছেন তার চেয়েও বেশি কিছু জানেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কোমায় থাকা অবস্থায় প্রলাপ বকেছি?'

'না, ঠিক তা নয়। প্রলাপের বিষয়গুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে

আগেই আলাপ করেছি। ভাষার ব্যাপারটা, ভূগোল সম্বন্ধে তোমার অসাধারণ জ্ঞান—এমন সব জায়গার কথা বলো যা ম্যাপ থেকে খুঁজে বের করতে হয়—কিছু কিছু নাম আবার এড়িয়ে যেতে চাও। থেকে থেকেই চিৎকার করে উঠতে—"পালাও", "লুকিয়ে পড়ো", "দৌড়াও", "আক্রমণ করো", "মারো", "আঘাত করো" ইত্যাদি—প্রত্যেকটা ব্যাপারই রীতিমত ভায়োলেন্ট। এ সময় তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠতে, কপালে ঘাম দেখা দিত। প্রায়ই তোমার হাত দুটো বিছানার সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিতে হত। এ সবই তো তোমাকে বলেছি। তবে এর বাইরেও অনেক কিছু আছে।'

'কি সেটা? আমাকে এতদিন বলেননি কেন?'

কারণ ব্যাপারটা শারীরিক। আমি ঠিক জানি না শোনার জন্যে এখনও তুমি তৈরি হয়েছ কিনা।'

রোগী আবার চেয়ারের পিঠে হেলান দিল। গভীর কালো চোখে অস্থিরতা। 'ডাক্তার রোগীর সমালোচনা করবে, সেটাই বা কোন আইনে বলে? আমি জানি আমি তৈরি। সবকিছু খুলে বলছেন না কেন?'

'তাহলে তোমার মাথা থেকেই শুরু করা যাক। ঠিক মাথাও নয়, তোমার চেহারার কথা বলছি।'

'চেহারা? কি হয়েছে চেহারায়?'

'ঠিক এ চেহারাটা নিয়ে জন্মাওনি তুমি।'

'কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

'সার্জারির চিহ্ন একজন ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। তোমার চেহারা পাল্টানো হয়েছে।'

'পাল্টানো হয়েছে!'

'প্লাস্টিক সার্জারি। চিবুক, চিক্-বোন, নাক আর চোখ বদলানো হয়েছে। কোমল গঠনে তীক্ষ্ণ ভাব আনার চেষ্টা করা হয়েছে। তোমার চোখ আগে আরও একটু গোল আর বড় ছিল, সেটাকে এখন সরু আর ছোট করা হয়েছে। নাক ছিল কিছুটা ভোঁতা, এখন সেটা পাতলা। এছাড়া বাঁ গালের ওপর থেকে একটা আঁচিলও উপড়ে ফেলা হয়েছে। সব মিলে তোমার চেহারায় বিশেষ একটা ছাপ ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু বুঝতে পারলে?'

'না।'

'তুমি দেখতে খুব সুদর্শন। তবে বিশেষ করে চোখে পড়ার মত কিছু নেই। সার্জারির মাধ্যমে তোমার জাতীয়তা বদলে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে বলেই আমার ধারণা।'

'জাতীয়তা!'

'হ্যাঁ, জাতীয়তা। রাস্তায় দেখা আর দশ জন শ্বেতাঙ্গ অ্যাঙলো-স্যাক্সন যুবকের সঙ্গে তোমার বর্তমান চেহারার কোন পার্থক্য নেই। তবে তুমি শ্বেতাঙ্গ নও। তোমাকে শ্বেতাঙ্গে পরিণত করা হয়েছে।'

রোগী বিস্ময়ে হা হয়ে গেল। অবাক চোখে উল্টেপাল্টে দেখতে থাকল হাতের পাঞ্জা।

'তোমার ত্বকের রঙও পরিবর্তন করা হয়েছে। না না, তুমি কোনদিনই কৃষ্ণাঙ্গ ছিলে না। তবে শ্বেতাঙ্গও নও। ত্বকের রঙ বদলানো সহজ কাজ নয়, বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ সার্জনের সাহায্যে করতে হয়েছে। এখন হঠাৎ করে রোদে-পোড়া শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে তোমাকে কেউ আলাদা করতে পারবে না। কিন্তু তুমি কি লক্ষ করেছ হাতের কব্জি, মুখ আর গলা বাদে তোমার শরীরের অন্যান্য অংশে বেশ কয়েক পোঁচ গাঢ়?'

নিজের অজান্তেই গালে হাত বুলাল রোগী, ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করছে।

'আরও একটা ব্যাপার আছে,' আবার শুরু করলেন ডাক্তার, 'তোমার চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলোকে নির্মূল করে দেয়া হয়েছে। গালের আঁচিলটাকে ওই কারণেই উপড়ে ফেলা হয়েছে বলে আমার ধারণা।'

'তাতে কি বোঝায়?'

'তার মানে খুব সহজেই ছদ্মবেশ নিতে পারো তুমি। চুলের রঙ বদলে ফেললেই তুমি সম্পূর্ণ অন্য একটা মানুষ। হ্যাঁ, তোমার চুলে নকল রঙ লাগানো আছে। তুমি কি সেটা লক্ষ করোনি? এই কয় সপ্তায় তোমার চুল বেশ একটু বড় হয়েছে, বাদামী চুলের গোড়ায় কালো চুল উঠতে শুরু করেছে। তোমার চুলের আসল রঙ কালো। চুল রঙ করে চশমা আর আলগা গোঁফ পরে নিলে কার সাধ্য তোমাকে চেনে! ছদ্মবেশ নেবার জন্যে আদর্শ চেহারা তোমার।' একটু থেমে আবার কথা বলতে শুরু করলেন ডাক্তার, একটু পর পর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। 'যতদূর মনে হয় তোমার বয়স চৌত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে। তবে যদি দশ বছর বেশি বা পাঁচ বছর কম হয় তাহলেও আশ্চর্য হব না।' আবার থেমে রোগীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগলেন ডাক্তার। রোগীর চেহারা ভাবলেশহীন, একটু আগের উত্তেজনার চিহ্ন মুছে গেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার শুরু করলেন ডাক্তার, 'আচ্ছা, গত সপ্তাহে চোখের যে ক'টা পরীক্ষা করেছিলাম তা মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার চোখ একদম স্বাভাবিক, চশমা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই।'

'চশমা ব্যবহার করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'তাহলে তোমার চোখের পাতা এবং রেটিনায় কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের চিহ্ন রয়েছে কেন?'

'আমি জানি না। কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি একটা ব্যাখ্যা দিই?'

অবশ্যই, এতসব ধাঁধা ভাল লাগছে না।'

'না শুনতে চাইলেই হয়ত ভাল করতে,' গ্লাস হাতে আবার জানালায় গিয়ে বাইরে উঁকি দিলেন ডাক্তার। 'কিছু কিছু কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহৃত হয় চোখের রঙ পাল্টাবার জন্যে। তোমার চোখ কালো। শ্বেতাঙ্গ চেহারায় সেটা একেবারেই বেমানান। আমার ধারণা কন্ট্যাক্ট লেন্স তুমি ব্যবহার করতে চোখের রঙ বদলানর জন্যে।'

'কেমন করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন আপনি?'

'প্রমাণ থেকেই বলছি। এসব কিছুরই চিহ্ন আছে, দাগ আছে।'

'কিন্তু ব্যাখ্যাগুলো আপনার নিজের। এমনও তো হতে পারে কোন দুর্ঘটনায় অঙ্গ বিকৃতি ঘটে আমার, প্লাস্টিক সার্জারি করে তা মেরামত করা হয়।'

'না, তোমার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। প্লাস্টিক সার্জারি নয়, তোমার দেহে কসমেটিক সার্জারি হয়েছে। গালের আঁচিল উপড়ে ফেলা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না। চুলের রঙটাই বা পাল্টানো হয়েছিল কেন? এমন কি দুর্ঘটনা ঘটল যাতে ত্বকের রঙ পাল্টানর দরকার পড়ল?'

'কত কিছুই তো হতে পারে! আপনি তো আর সঠিক জানেন না!'

'ভাল। খুব ভাল। আমার ওপর রাগ ঝাড়ো। রাগ করলে কোন ক্ষতি নেই। তবে সঙ্গে সঙ্গে যদি মস্তিষ্কটাকে একটু খাটাও, তাহলে ভাল হয়। চিন্তা করে দেখো তো, তুমি কে? কি পেশা ছিল তোমার?'

'আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার কর্মচারী···সরকারী চাকুরে···কিংবা ব্যবসায়ী···এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও হতে পারি।'

'যে কোন একটা বেছে নাও।'

'আমি···জানি না।' রোগীর কালো দু'চোখে শঙ্কার ছায়া।

'কারণ তুমি জানো এগুলোর কোনটাই তোমার পেশা নয়।'

সম্মতির ভঙ্গিতে ওপর নিচ মাথা ঝাঁকাল রোগী। 'ঠিকই বলেছেন। আপনার কি ধারণা আমার পেশা সম্বন্ধে?'

'সত্যি বলতে কি এই একটা বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই। তোমাকে দেখলে মনে হয় শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করো তুমি। না না, খেলোয়াড় বা সেরকম কিছু নয়। তোমার শরীরের মাংসপেশী খুব দৃঢ়, হাত দুটো কর্মঠ, শক্তিশালী। আমার অনুমান ভুল না হলে প্রচণ্ড শক্তি ধরো তুমি। হঠাৎ করে দেখলে তোমাকে শ্রমিক বা জেলে মনে হবে, দৈহিক পরিশ্রম করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু তোমার জ্ঞানের গভীরতা এবং বুদ্ধির পরিধির সঙ্গে তা একটুও খাপ খায় না।'

'কেন যেন মনে হচ্ছে বিশেষ কিছু একটা বলতে চাইছেন আপনি।'

'কারণ গত কয়েক সপ্তাহ সর্বক্ষণ একসঙ্গে আছি আমরা। ইতিমধ্যেই আমার আচার-আচরণ সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা হয়েছে।'

'তার মানে আমার ধারণা সত্যি?'

'হ্যাঁ। আমি দেখতে চেয়েছিলাম তোমার শারীরিক পরিবর্তনের তথ্যগুলো তুমি কিভাবে গ্রহণ করো।'

'পরীক্ষায় পাস করতে পেরেছি তো?'

'বেশ ভাল মার্ক নিয়েই পাস করেছ। দেরি করার কোন কারণ দেখি

না, বলার সময় হয়েছে। সত্যি বলতে কি চেপে রাখার মত ধৈর্যও আর আমার অবশিষ্ট নেই। এদিকে এসো।' ডক্টর টুক্সবেরী লিভিং রুমের ভেতর দিয়ে দরজা খুলে ডিসপেনসারিতে চলে এলেন, রোগী অনুসরণ করল তাঁকে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জানালার পর্দা টেনে ঘরটা অন্ধকার করে দিলেন ডাক্তার। তারপর কোণ থেকে ভারি কিছু একটা বয়ে নিয়ে এলেন। পুরানো বেঢপ আকারের একটা প্রজেক্টার, লেন্সের ঢাকনায় মর্চে ধরেছে, ফাটল ধরেছে এখানে সেখানে। 'গত সপ্তাহেই মার্সেই থেকে এটা আনিয়েছি,' বলতে বলতে প্রজেক্টারটা ছোট একটা ডেস্কের ওপর রাখলেন ডাক্তার, তারপর সকেটে প্লাগটা ঢুকিয়ে দিলেন। 'বহু পুরানো জিনিস, তবে আমাদের কাজ চলে যাবে। দেয়ালের চার্টটা নামিয়ে রাখো। একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।'

নাম-না-জানা স্মরণশক্তিহীন লোকটা ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঝোলানো চার্টটা খুলে চেয়ারের ওপর রেখে দিল। ডাক্তার প্রোজেক্টারের আলো জ্বালতেই সাদা দেয়ালের মাঝখানের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠল। ডাক্তার কাঁপা হাতে লেন্সের পেছনে ছোট্ট একটা সেলুলয়েডের টুকরো ঢুকিয়ে দিলেন।

দেয়ালের আলোকিত চৌকো অংশে ইংরেজিতে লেখা কয়েকটা লাইন ফুটে উঠল কয়েকশ গুণ বড় হয়ে।

গেমেইনশ্যাফ্‌ট ব্যাঙ্ক
ব্যানহফস্ট্রাসে, জুরিখ।
জেরো—সেভেন—সেভেনটিন—টুয়েল্‌ভ—জেরো—
ফোরটিন—টোয়েন্টি সিক্স—জেরো

'এটা কি?' বিস্ময়ে রোগীর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

'ভাল করে মন দিয়ে দেখো। চিন্তা করো। কি হতে পারে বলে মনে হয়?'

'কোন ধরনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।'

'এক্কেবারে নির্ভুল অনুমান। ছাপার অক্ষরে লেখা প্রথম দুটো লাইন একটা ব্যাঙ্কের ঠিকানা, নিচে হাতে লেখা নাম্বারগুলো সম্ভবত কারও নামের কোড—অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট-মালিকের সই। সুইস ব্যাঙ্কের সাধারণ নিয়ম।'

'কোথাও পেয়েছেন এটা?'

'তোমার কাছ থেকে। নেগেটিভটা খুবই ছোট, থার্টি-ফাইভ মিলিমিটার ফিল্মের অর্ধেকের বেশি নয়। তোমার ডান নিতম্বের উপরের দিকে চামড়ার ঠিক নিচে ছিল এটা। পাকা সার্জনের হাতের কাজ। হাতের লেখাটা তোমার—আমার যতদূর ধারণা এই নাম্বার ক'টা দিয়ে তুমি জুরিখের ব্যাঙ্কের একটা ভল্ট খুলতে পারবে।'

দুই

দু'জনে মিলে ভেবেচিন্তে জাঁ-লুই নামটা ঠিক করল। খুবই সাধারণ নাম, পোর্ট নোয়াতেই এ নামে আরও দু'জন আছে। অহেতুক মানুষের কৌতূহল উদ্রেক করা ঠিক হবে না, তাই সবচেয়ে সাধারণ নামটাই ওরা বেছে নিল। নাম ছাড়া তো আর চলা যায় না।

ডক্টর টুক্সবেরী মার্সেই থেকে ছ'টা বই আনিয়ে দিলেন। চারটা ফরাসী ভাষায় লেখা আর দুটো ইংরেজি। মস্তিষ্কের এবং মানসিক আঘাতজনিত চিকিৎসাবিদ্যার বই। দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা সচিত্র ব্যাখ্যা সহ চ্যাপ্টারগুলো পড়ে বোঝা গেল কোন একধরনের অ্যামনিশিয়াতে আক্রান্ত হয়েছে সে।

'কোন নিয়ম নেই,' টেবিল ল্যাম্পের আলোর স্বল্পতায় চাপ পড়ছে চোখে, চোখ ডলতে ডলতে 'জাঁ-লুই' বলল, 'যা বুঝলাম, ব্যাপারটা জ্যামিতিক ধাঁধার মত। যে কোন কম্বিনেশনে যে কোন পথে স্মৃতি ভ্রংশ ঘটতে পারে। শারীরিক বা মানসিক—অথবা দুটো কারণই সমানভাবে এর জন্যে দায়ী হতে পারে। স্মৃতি পুরোটা কিংবা কিছুটা নষ্ট হতে পারে আবার স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীও হতে পারে। কোন নিয়মকানুন নেই!'

'ঠিক,' ডাক্তার আজও তাঁর চেয়ারে বসে গ্লাসের হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছেন। 'তোমার ক্ষেত্রে কি ঘটেছে সেটা অনুমান করা যায়।'

'যেমন?' উৎসুকভাবে মুখ তুলে তাকাল 'জাঁ-লুই'।

'একটু আগে বললে না। "দুটো কারণই সমানভাবে এরজন্যে দায়ী হতে পারে"। প্রচণ্ড শারীরিক এবং মানসিক আঘাত পেয়েছ তুমি। শরীর এবং মনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। তোমার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে দুটো দিকই একসঙ্গে কাজ করেছে।' ক্লিপবোর্ডে আটকানো বেশ কিছু কাগজ তুলে নিলেন ডাক্তার। 'যেদিন তোমাকে এখানে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল, তারপর থেকে শুরু করে প্রতিদিনের রিপোর্ট রয়েছে এখানে। বুঝিয়ে বলছি। তোমার শরীরের আঘাতগুলো দেখে বোঝা যায় ঘটনার সময় প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ছিলে তুমি। এরপর কমপক্ষে নয়/দশ ঘণ্টা পানিতে ছিলে যা হিস্টিরিয়ার জন্যে দায়ী, তখনই আসল

ক্ষতিটা হয়। অন্ধকার, প্রচন্ড শক্তিশালী ঢেউ, শ্বাস নেবার কষ্ট, সীমাহীন পানির রাজ্য—এ সবই হিস্টিরিয়ার আদর্শ উপাদান। তবে সে মুহূর্তে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত না হলে তুমি এরপরে বেঁচে থাকতে কিনা সন্দেহ। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'মনে হয় পারছি। আমার শরীর আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছিল নিজে থেকেই, হিস্টিরিয়ার মাধ্যমে।'

'শরীর নয়, মন। দুটোকে আলাদা করে দেখতে চেষ্টা করো, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য মনও ঠিক নয়, আসলে মস্তিষ্ক।' ডান হাতের মধ্যমা ছুঁইয়ে কাগজ ওল্টাতে লাগলেন ডাক্তার। 'তুমি যখন কোমার মধ্যে প্রলাপ বকেছো বা ঘুমের মধ্যে কথা বলে উঠেছিলে, তার সবই লিখে রেখেছি আমি। শুধু তাই নয়, তোমার হাঁটা-চলা, কথা বলার ভঙ্গি, শব্দচয়ন, ইন্টারেস্ট সবই পর্যবেক্ষণ করেছি আমি ধৈর্য ধরে। সত্যি বলতে কি তোমার আচার-আচরণ খুবই পরস্পর বিরোধী।'

'কিন্তু কিছুই তো জানি না এখনও!' অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠল 'জাঁ-লুই।'

'তোমার পেশা বা পরিচয় সম্পর্কে কিছু হয়ত এখনও জানতে পারিনি আমরা, তবে কিছু কিছু ব্যাপার জেনেছি। যেমন কি ধরনের পরিবেশের সঙ্গে তুমি পরিচিত বা কিসে তোমার উৎসাহ বেশি।'

'বুঝলাম না।'

'একটা উদাহরণ দেই।' হাতের ক্লিপবোর্ডটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর টুক্সবেরী। দেয়ালের কোণে বহু পুরানো ঝরঝরে একটা কাবার্ড রাখা আছে, এগিয়ে গিয়ে সেটার ওপরের ড্রয়ার খুলে বিশাল একটা অটোমেটিক হ্যান্ডগান তুলে নিলেন। চমকে উঠল 'জাঁ-

লুই,' নিজের অজান্তেই শরীরের প্রতিটা পেশী শক্ত হয়ে উঠল। ভাবান্তরটা ডাক্তারের চোখ এড়াল না। 'আমি কখনও এটা ব্যবহার করিনি। কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কেও খুব একটা ভাল ধারণা নেই। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে রাখতেই হয়। ইতিমধ্যেই তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছ কিরকম বিপদজনক জায়গা এটা।' একটু হাসলেন ডাক্তার, তারপর কোন কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ করেই হ্যান্ডগানটা ছুঁড়ে দিলেন ওর দিকে। একটুও না চমকে দক্ষ হাতে লুফে নিল জাঁ-লুই'। 'ভেঙে ফেলো অস্ত্রটাকে।'

'কি?'

'ভাঙো,' চোখে চোখ রেখে বললেন ডাক্তার।

কোলে রাখা হ্যান্ডগানটার দিকে তাকাল 'জাঁ-লুই'। তারপর ওর হাতের আঙুলগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে হ্যান্ডগানটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মুখ তুলে ডাক্তারের দিকে চাইল 'জাঁ-লুই'।

'কি বলতে চাচ্ছিলাম এখন বুঝলে তো?' বললেন ডক্টর টুক্সবেরী। 'অন্য অনেক বিষয়ে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কেও অসাধারণ জ্ঞান রয়েছে তোমার।'

'সেনাবাহিনী?' 'জাঁ-লুইয়ের' কণ্ঠে অবিশ্বাস আর সতর্কতা।

'যদ্দূর মনে হয়, না,' চোখ কুঁচকে চিন্তা করছেন ডাক্তার। 'তোমার ডেন্টাল ওয়ার্ক সম্বন্ধে আগেই কথা বলেছি আমি। শতকরা একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারি, ওটা মিলিটারি ডেন্টিস্টের কাজ নয়। তাছাড়া সার্জারির ব্যাপারটাও মিলিটারির সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না।'

'তাহলে কি?'

'ওটা নিয়ে এখন মাথা না ঘামালেও চলবে। আমার যতদূর বিশ্বাস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক দক্ষতার পুরোটাই ফিরে পাবে তুমি। তবে স্মরণশক্তি ফিরবে কিনা তা বলা কঠিন। অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।'

পাথরের মূর্তির মত বসে রইল জাঁ-লুই। 'জুরিখেই রয়েছে সব রহস্যের সমাধান,' আস্তে আস্তে বলল সে।

'এখন নয়। এখনও তৈরি হওনি তুমি। শারীরিক শক্তির পুরোটা ফিরে পেলেই জুরিখে যাবার কথা চিন্তা করা যাবে।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে উঠতে হবে। জুরিখে আমাকে পৌঁছতে হবেই।'

'অবশ্যই তুমি যাবে জুরিখে।'

আরও দু'সপ্তাহ কেটে গেল। নিয়মিত শরীরচর্চার ফলে হারানো শক্তি ফিরে আসছে। দ্বীপে পৌঁছাবার পর এটা উনিশতম সপ্তাহ। উষ্ণ উজ্জ্বল সকাল, মেডিটেরেনিয়ানের শান্ত জলে ঝকঝক করছে পূর্ণযৌবনা সূর্যের প্রতিবিম্ব। গত একঘণ্টা সমুদ্রের তীর ধরে পাহাড়ী পথে দৌড়েছে 'জাঁ-লুই'। প্রতিদিন একটু একটু করে শরীরচর্চার সময়সীমা বাড়াচ্ছে সে, কমিয়ে দিচ্ছে বিশ্রামের সময়। আজ একটানা বারো মাইল দৌড়েছে। শোবার ঘরের জানালার পাশে চেয়ারে বসে হাঁপাচ্ছে, ঘামে ভিজে গেছে সাদা সুতীর শার্টটা। পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে সে। কারণ সামনের লিভিং রুমটা সকালের এই সময়টায় রোগীদের ওয়েটিং-রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিদিন সকালে একদল চাষাভুষো ভয়ার্ত মুখে অপেক্ষা করতে থাকে—তাদের একমাত্র চিন্তা—ডাক্তার নিজে কতটা সুস্থ অবস্থায় আছেন। তবে আজকাল

ডাক্তার মাতাল হলেও মাত্রা ছাড়িয়ে যান না।

দরজা খুলে ঢুকলেন ডক্টর টুক্সবেরী। সাদা পোশাকের সামনের দিকটায় রক্তের ছিটে।

'হয়ে গেল!' খুশিতে ফেটে পড়ছেন ডাক্তার। 'ডাক্তারী ছেড়ে এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি খুলে বসলেই মনে হয় ভাল করতাম।'

'ব্যাপারটা কি?' জাঁ-লুই প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল।

'এ ব্যাপারে আগেও তোমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে তোমাকে, মিশতে হবে মানুষের সঙ্গে। তাই আমার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মঁশিয়ে জাঁ-লুইয়ের একটা চাকরি হয়ে গেল। অন্তত এক সপ্তাহর জন্যে তো বটেই।'

'কেমন করে এই অসাধ্য সাধন করলেন? গ্রামে তো কাজ নেই বলেই জানি।'

'গ্রামে কাজ না থাকলে কি হবে, হতভাগা রিশের পায়ের ক্ষতে তো ইনফেকশন হয়েছে! ছোট্ট একটা অপারেশন দরকার। তা ব্যাটাকে বললাম আমার লোকাল অ্যানেস্থিটিকের স্টক একেবারেই কম। তারপরে তোমার চাকরি নিয়ে দরকষাকষি করতে আর কোন সমস্যা হয়নি।'

'এক সপ্তাহ?'

'ভাল কাজ করলে পরের বারও হয়ত তোমাকে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু, ডক্টর, এর কি কোন দরকার আছে? আমি তো একদম সুস্থ হয়ে উঠেছি। জুরিখে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি, আপনি তো জানেনই।'

'বাইরে থেকে দেখেও তোমাকে তৈরি বলেই মনে হয়। কিন্তু ঝুঁকি নিলে চলবে না। কিছু সময় বিশেষ করে কয়েকটা রাত সমুদ্রে কাটানো

তোমার জন্যে খুবই দরকার। আয়েশী যাত্রীর মত নয়, সত্যিকারের প্রতিকূল পরিবেশে।'

'আর একটা পরীক্ষা, তাই না?'

'এই হতচ্ছাড়া পোর্ট নোয়াতে বসে যতটুকু করা যায় করার চেষ্টা করছি। যদি সম্ভব হত তবে কৃত্রিম উপায়ে একটা জোরাল ঝড় আর জাহাজডুবিরও ব্যবস্থা করতাম। অবশ্য রিশে নিজেও একটা ঘূর্ণীঝড় বিশেষ। পাজীর পা-ঝাড়া। ওর নিজের লোকদের মধ্যে থেকে একজনকে বাদ দিয়ে তোমাকে নিতে হচ্ছে বলে এমনিতেই খেপে আছে। পায়ের ব্যথা কমে গেলেই নিজমূর্তি ধারণ করবে।'

'বাহ্! বাহ্! অসংখ্য ধন্যবাদ, চমৎকার সঙ্গী বেছেছেন!'

'আখেরে এতে তোমার উপকারই হবে। জ্ঞান হারাবার আগে যাদের সঙ্গে ছিলে তারাও খুব বন্ধুভাবাপন্ন ছিল বলে মনে হয় না। মনে করো ট্রেনিঙে যাচ্ছ, দরকারি অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরবে।'

'হ্যাঁ, মাঝ সাগরে শালার ব্যাটা রিশে আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা চ্যাংদোলা করে আমাকে হাঙরের মুখে ফেলে দিলেই ট্রেনিঙটা পুরো হয়!'

হেসে উঠলেন ডাক্তার, 'আরে না না, ভয়ের কিছু নেই। ওরা জানে তুমি আমার লোক। আপদে বিপদে আমিই ওদের একমাত্র ভরসা, আমাকে রাগানর সাহস কারও হবে না।'

'কিন্তু আপনি তো এই নরক থেকে বেরুতে চান। আমি জানি আপনি আশা করে আছেন আমি আপনাকে সাহায্য করব এ ব্যাপারে।'

'তুমি বুদ্ধিমান ছেলে,' ডাক্তারের চোখে প্রশংসা, 'কিন্তু আর আড্ডা নয়, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। রিশে তোমাকে সঙ্গে করে ডকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে।

আগামী কাল ভোর চারটায় তুমি ওর নৌকোয় হাজিরা দেবে।মন থেকে দ্বিধা দূর করে দাও। মনে করো সমুদ্রবিহারে যাচ্ছ।'

সমুদ্রবিহার না হাতি! নোংরা তেল চুপচুপে নৌকোটার স্কিপার রিশে বুনো শুয়োরের মত বদরাগী, সর্বক্ষণ মুখ থেকে ভক্‌ভক্‌ করে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তিনজন কর্মচারীর প্রত্যেকেই ষণ্ডা ধরনের, অবশ্য ভাল কোন লোক কি রিশের সঙ্গে টিকে থাকতে পারত! ও যে লোকের জায়গায় কাজ করছে, সে আবার চীফ নেটম্যান পিয়েরের ছোট ভাই। নৌকোটা হারবার ছেড়ে সাগরে ভাসার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জাঁ-পিয়ের ওর মুখোমুখি হল।

'আমার ভাইয়ের টেবিল থেকে খাবার ছিনিয়ে নিয়েছ তুমি!' চাপা কণ্ঠে গরগর করে উঠল পিয়ের, অনবরত বিড়ি টানছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে জাঁ-লুইয়ের মুখের ওপর। 'ওর বাচ্চাগুলোর প্লেটে খাবার নেই।'

'মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে,' প্রতিবাদ করল জাঁ-লুই। ডাক্তারের ওপর রাগ হল, আসাটা যদি এতই জরুরি ছিল তবে লোকটাকে এই এক সপ্তাহের মজুরি হিসেব করে দিয়ে দিলে কি ক্ষতি হত!

'আশাকরি কাজ ভালই জানো তুমি!' পিয়েরের চোখে নগ্ন প্রতিহিংসা।

দুঃখের বিষয় কাজের 'ক'-ও সে জানে না।

পরবর্তী বাহাত্তর ঘণ্টা দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফিরল ওকে। পদে পদে অপমান আর গালিগালাজ, কঠিন পরিশ্রম আর বিশ্রামের অভাবে তিন দিনেই ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে দিল। পালা করে দু'জনে মিলে পাহারা দেয়, রাতে চোখ দুটো ঘুমে লেগে এলেই ডেকে তুলে বিভিন্ন

অপ্রয়োজনীয় কাজের ভার চাপিয়ে দেয়। ফলে রাতেও বিশ্রামের কোন অবকাশ নেই। অবশ্য রিশে সরাসরি ওর সঙ্গে কোনরকম খারাপ ব্যবহার করল না, যদিও সন্দেহ নেই সবকিছুতেই তার নিঃশব্দ সম্মতি রয়েছে। ডাক্তারের অনুরোধ রক্ষা করছে ঠিকই, তবে আগামী সপ্তাহে যাতে ওকে আবার সঙ্গে নিতে না হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যায় পোর্ট নোয়ার উদ্দেশ্যে নৌকো ঘোরাল রিশে, মাছের বোঝা বন্দরে নামিয়ে সূর্য ওঠার আগেই আবার সমুদ্রে ভেসে পড়বে। পিয়ের আর তার সহকারী মাছধরা জালগুলো ভাঁজ করে মিডশিপে গুছিয়ে রাখছে। দু'জনে মিলে জাঁ-লুইয়ের হাতে লম্বা হাতল ওয়ালা একটা ব্রাশ ধরিয়ে দিয়েছে, সেটা ঘষে ঘষে ডেক থেকে মাছের শুকনো রক্ত আর ময়লা তোলার চেষ্টা করছে। সামনে দিয়ে যাবার সময় পিয়ের হঠাৎ করে পানি ভর্তি বিশাল একটা বালতি ওর পায়ের কাছে আছড়ে ফেলল। সময়মত ছিটকে সরে না গেলে সোজা পায়ের পাতায় আঘাত করত সেটা। কোন কথা না বলে নিজের কাজ করে যেতে লাগল সে। এবার পিয়ের বালতি ভর্তি পানি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ব্রাশের আশেপাশের জায়গা ভিজিয়ে দিতে লাগল যাতে পরিষ্কার করতে সুবিধা হয়। এবারও হঠাৎ করেই বালতির পানি অনেকটা উঁচুতে ছুঁড়ে দিল সে, সোজা জাঁ-লুইয়ের মুখের ওপর। সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গেল বেচারা। ভারসাম্য হারিয়ে হাতের ভারি ব্রাশটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, সেটা সোজা গিয়ে আঘাত হানল পিয়েরের উরুতে। বলা বাহুল্য এটাও পুরোপুরি দুর্ঘটনা ছিল না। ব্যথায় কাতরে উঠে গালি দিয়ে উঠল পিয়ের।

'এক্সক্যুসে মোয়া,' ক্ষমা প্রার্থনা করল জাঁ-লুই, দু'হাতে ডলে ডলে চোখ থেকে পানি মোছার চেষ্টা করছে।

'শুয়োরের বাচ্চা! চোখ দুটো কি বাড়িতে রেখে এসেছিস?'

'তোমার চোখই তোমার সঙ্গে নেই। বালতির পানি ডেকে না ছুঁড়ে আমার চোখে ছুঁড়েছ কেন? তাছাড়া আমি ক্ষমা চেয়েছি।'

'আচ্ছা! কথা ফুটেছে তাহলে! আয় দেখি, কত তেল হয়েছে!' দু'হাতে ব্রাশটা বাগিয়ে ধরে কুঁজো হয়ে সামনে লাফ দিল পিয়ের, চোখে হিংস্র উল্লাস।

কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই বিদ্যুৎবেগে ডান হাতে ব্রাশের হাতলটা ধরে ফেলল জাঁ-লুই, প্রাণপণে পিয়েরের ভুঁড়িতে গুঁতো দিল, পরমুহূর্তেই ব্রাশটা সামনের দিকে টান দিল। একইসঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিতে বাঁ পা ঘুরিয়ে পিয়েরের কণ্ঠনালীতে আঘাত হানল। নিজের এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। মারামারি করার চিন্তা আদৌ ওর মাথায় ছিল না, অথচ মনে হচ্ছে যেন আগে থেকেই ও জানত কি করতে হবে।

ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে ডেকে লুটোপুটি খেতে থাকা পিয়েরের গলা দিয়ে। চিন্তা করার সময় পেল না জাঁ-লুই, ডান পা'টা যেন নিজ থেকেই আছড়ে পড়ল লোকটার বাম কিডনির ওপর। জন্তুর মত চিৎকার করে উঠল পিয়ের।

পেছন থেকে গলা টিপে ধরল কে যেন। বাঁ হাতে লোকটার তলপেটে ঘুসি বসাল জাঁ-লুই। তারপর সামনে ঝুঁকে আক্রমণকারীর ডান কনুই চেপে ধরে ঝটকা মেরে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল লোকটাকে। ডেকের অন্যপাশে আছড়ে পড়ল শরীরটা। ধীরেসুস্থে হেঁটে তার পাশে এসে দাঁড়াল জাঁ-লুই, খপ্ করে ডানহাতের কব্জি ধরেই উল্টোদিকে ঝটকা মারল। মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ হল, জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল লোকটা।

তৃতীয় জন সভয়ে পিছিয়ে গেল আক্রমণের চেষ্টা না করে। ধাওয়া না করে ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে রইল জাঁ-লুই। রিশের কর্মচারী দু'জনের জ্ঞানহীন দেহ পড়ে রইল ডেকে, সকালের ফিরতি যাত্রায় যোগ দেবার ক্ষমতা কারোই হবে না। বাকি জনও ভয়ে আধমরা হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে থ্রট্‌ল্ ছেড়ে রিশে এসে হাজির হয়েছে দৃশ্যপটে। 'কোন জাহান্নাম থেকে তুমি নেমে এসেছ জানি না, কিন্তু নৌকো তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নৌকোয় যেন তোমাকে আর না দেখি,' রিশের কণ্ঠে উপচে পড়ছে ঘৃণা আর ক্রোধ।

স্মরণশক্তিহীন নিষ্ঠুর লোকটার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটা হাসির রেখা দেখা দিল, কোন জাহান্নাম থেকে সে এসেছে আসলে তা ও নিজেই জানে না।

'এখানে আর থাকা চলবে না তোমার?' অন্ধকার শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন ডক্টর টুক্সবেরী। 'তোমাকে বলেছিলাম কেউ তোমার গায়ে হাত তুলবে না। কিন্তু তুমি গোলমাল বাধালে আমার কিছু করার নেই।'

'আমাকে ওরা বাধ্য করেছে।'

'একজনের হাত ভেঙেছে, আর একজনের কণ্ঠনালী থেঁতলে গেছে, মাথা আর গালে গোটা দশেক সেলাই পড়েছে। অথচ তোমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। তারপরেও তুমি বলবে ওরা বাধ্য করেছে?'

'ডাক্তার, অনেক কিছু ঘটে গেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলার দরকার...'

ওকে থামিয়ে দিলেন ডাক্তার, 'কিন্তু কথা বলার সময় নেই। তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুণি চলে যেতে হবে তোমাকে।'

'এক্ষুণি!'

'হ্যাঁ। আমি ওদেরকে বলেছি তুমি শুঁড়িখানায় গেছ ফুর্তি করতে। ওই দু'জনের আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তোমাকে খুঁজতে বের হবে। ওখানে না পেলে ফিরে আসবে এখানে। তোমাকে না পাওয়া পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজবে পুরো দ্বীপ।'

'আত্মরক্ষার জন্যে দু'জন লোককে মেরেছি বলে?'

'না, দু'জন লোককে অকর্মণ্য করে কিছুদিনের নিশ্চিত আয় থেকে দুটো পরিবারকে বঞ্চিত করেছ বলে। তবে আসল কারণ অন্য। দ্বীপের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ দু'জন জেলেকে মারধর করে এদেরকে অপমান করেছ তুমি। শোধ না নিয়ে বিশ্রাম নেবে না কেউ। এখন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। মার্সেই থেকে আসা একটা বোট আছে জেটিতে। ক্যাপ্টেন রাজি হয়েছে তোমাকে সাহায্য করতে। সেইন্ট লরাঁ-র আধা মাইল উত্তরে তোমাকে নামিয়ে দেবে সে।'

'তাহলে সময় এসে গেল!'

হাসলেন ডক্টর টুক্সবেরী। 'আমি জানি তোমার ভেতরে কিরকম ঝড় বইছে। অসহায় আর একা একা লাগছে, তাই না? আমি ছিলাম তোমার একমাত্র গুরু। কাল থেকে সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবে তুমি। কোনভাবেই তোমাকে আর সাহায্য করতে পারব না আমি। কিন্তু বিশ্বাস করো, তুমি একটুও অসহায় নও। কখন কি করতে হবে নিজেই বুঝতে পারবে।' অয়েলক্লথে মোড়া ছোট্ট একটা প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন তিনি, 'নাও, এটা কোমরে বেঁধে ফেলো।'

'কি এটা?' হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল জাঁ-লুই।

'আমার সঞ্চয়। দু'হাজার ফ্রাঁ। তোমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, কিন্তু আশাকরি কাজে লাগবে। আমার পাসপোর্টটাও আছে ভেতরে। আমি তোমার চেয়ে দু'চার বছরের বেশি বড় হব না। তাছাড়া পাসপোর্টটা আট বছরের পুরানো, মানুষের কতরকম পরিবর্তনই তো হতে পারে। অবশ্য এটা আদৌ কোন কাজে নাও লাগতে পারে। তাও সঙ্গে রেখো, বলা যায় না কখন কোনটা কাজে লেগে যায়।'

'পাসপোর্ট ছাড়া আপনি অসুবিধেয় পড়বেন।'

'তুমি যদি আমার সঙ্গে আর কোনদিন যোগাযোগ না করো, তবে এমনিতেই আর কখনও ওটার প্রয়োজন পড়বে না।'

'আপনি ভাল লোক।'

'আমার মনে হয় তুমিও।' দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি ওকে।

রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে আছে লোকটা, পোর্ট নোয়ার অনুজ্জ্বল আলোর সারি ছোট হতে হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছে মাছধরা নৌকোটা, পাঁচ মাস আগে যেখান থেকে ভেসে এসেছে ও।

আজ আবার সেই অন্ধকারের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছে সে।

তিন

ফ্রান্সের উপকূলে কোন আলো জ্বলছে না, শুধু চাঁদের ম্লান আলোয়

আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে পাথুরে বেলাভূমি। তীর থেকে এখনও দু'শো গজ দূরে রয়েছে ওরা, বোট ধীরে ধীরে ঢুকছে ইনলেটে। ক্যাপ্টেন তর্জনী তুলে ডানদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'ওই বড় বড় পাথরের স্তূপ দুটোর মাঝখানে এক চিলতে জমি আছে। জায়গাটা খুবই সরু, তবে ডানদিকে সাঁতার কাটলে ঠিকই খুঁজে পাবে। চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুটের মত, দু'এক মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। আশাতীত উপকার করেছেন আপনি।'

'এটা ডাক্তারের পাওনা। তুমি যে ঝড়ে পড়ে পোর্ট নোয়ায় পৌঁছেছিলে, সেই ঝড়ে আমার তিনজন লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়। ডাক্তার চিকিৎসা করে ওদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আপনি আমাকে চেনেন!'

'টেবিলের ওপর ঘড়ির মত সাদা দেখাচ্ছিল তোমার অচেতন দেহটাকে। তবে আমি জানি না তুমি কে, জানতে চাইও না। ডাক্তারকে দেবার মত পয়সা আমার ছিল না, আজও নেই। তোমাকে সাহায্য করে সেই ঋণটুকু শোধ করার চেষ্টা করছি।'

'আমার কিছু কাগজপত্র দরকার,' আশায় দুলে উঠল জাঁ-লুইয়ের হৃদয়, সাহায্য চাইতে দ্বিধা করল না, 'একটা পাসপোর্টে কারুকাজ করতে হবে।'

'আমাকে বলছ কেন? আমি তোমাকে মার্সেইতে নিয়ে যেতে পারব না, বন্দরে পুলিশের বোট গিজগিজ করছে। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল তোমাকে সেইন্ট লরাঁর উত্তরে নামিয়ে দেয়া। ব্যস।'

'তার মানে মার্সেইতে গেলে কাগজপত্রগুলো ঠিক করে নিতে পারব। আর আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'আমি ওরকম কিছু বলিনি।'

'হ্যাঁ, বলেছেন। আপনি বলেছেন যেখানে আমার কাজ হবে সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না। আপনি বলেছেন।'

'বলেছি? কি বলেছি?'

'বলেছেন আমি যদি মার্সেইতে পৌঁছাতে পারি, তবে আপনি ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

ক্যাপ্টেন সরু চোখে লোকটার আপাদমস্তক যাচাই করল। তারপর বলল, 'ওল্ড হারবারের দক্ষিণে রু্য সারাসিনের ওপর একটা ক্যাফে আছে। নাম "স্যুই শ্যালে"। আজ রাত ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ওখানে থাকব আমি। সঙ্গে কিছু টাকা নিয়ে এসো।'

'কত?'

'নির্ভর করে তোমার আর যার সঙ্গে তুমি কথা বলবে তার ওপর।'

'তবুও একটা ধারণা থাকা ভাল।'

'পাসপোর্ট যদি তুমি দাও, তাহলে খরচ কম হবে। কিন্তু যদি অন্য কারোটা চুরি করতে হয় তবে দ্বিগুণ হয়ে যাবে মজুরি।'

'আমি তো বলেছি আমার কাছে একটা আছে।'

শ্রাগ করল ক্যাপ্টেন। 'পনেরো শো থেকে দু'হাজার ফ্রাঁ।'

কোমরের সঙ্গে বাঁধা অয়েলক্লথে মোড়া প্যাকেটটার কথা চিন্তা করে ডাক্তারের প্রতি আর একবার কৃতজ্ঞতা জানাল সে মনে মনে। অবশ্য ওতে টায় টায় দু'হাজার ফ্রাঁই আছে। কিন্তু এ মুহূর্তে পাসপোর্টটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি, যদি পুরোটা খরচ হয়ে যায় তা-ও সই। 'তাহলে রাতে দেখা হচ্ছে?'

অন্ধকারের দিকে চাইল ক্যাপ্টেন। 'এর চেয়ে বেশি কাছে আর যাবে না বোট। মনে রেখো, মার্সেইতে যদি আজ রাতে আমাদের দেখা

না হয় তবে তুমি জীবনেও কখনও আমাকে দেখোনি। আমার কর্মচারীরাও কেউ তোমাকে দেখেনি, তুমিও ওদেরকে দেখোনি।'

'আজ রাতেই আমাদের দেখা হবে। স্যুই শ্যালে, রু্য সারাসিন, ওল্ড হারবারের দক্ষিণে।'

'আর হ্যাঁ, স্যুই শ্যালের লোকজন স্থানীয় ফরাসীতে কথা বলে। শুদ্ধ ভাষাটা একটু দুমড়ে মুচড়ে চলতি টান আনার চেষ্টা কোরো। আমি চাই না ওরা জানুক তুমি প্যারিসের বাসিন্দা নও।' হাত উঁচিয়ে থ্রট্‌লে বসা কর্মচারীর দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাপ্টেন, কমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

'সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ,' বলে গানেল টপকে পানিতে নেমে পড়ল সে। এক হাতে ছোট্ট হাতব্যাগটা পানির ওপর ভাসিয়ে রেখে, নিজেকে ভেসে রাখার জন্যে দ্রুত পা নাড়ছে। 'রাতে দেখা হবে,' নিচ থেকে ক্যাপ্টেনকে দেখা যাচ্ছে না, তবুও আস্তে করে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে বলল।

আচমকা নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে এল চারদিকে। পাথুরে তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা পানিতে শিউরে উঠল সে, তীরের উদ্দেশ্যে সাঁতার কাটতে শুরু করল। কষ্ট করতে হল না, স্রোতের টানে একরকম ভেসেই চলেছে। শেষের গজ ত্রিশেক জায়গা পার হতেই যা একটু অসুবিধা হল। অবশেষে বুনো ঘাসে ঢাকা বালিতে পৌঁছুল সে, হাতের ব্যাগটা তখনও প্রায় শুকনোই আছে। ভোরের আলো উঁকি মারছে মেঘের পেছন থেকে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য উঠে যাবে। সময় নেই, তার আগেই সরে পড়তে হবে।

হাতব্যাগ খুলে একজোড়া বুট, মোজা, দোমড়ানো মোচড়ানো পুরানো একটা প্যান্ট আর ডেনিম শার্ট বের করল। পরনের ভেজা

শর্টস্‌টা খুলে মেলে দিল ঘাসের ওপর। সাগরের মুখোমুখি নগ্ন শরীরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে অনুভব করল ভয়ের শীতল স্রোত নেমে আসছে মেরুদণ্ড বেয়ে।

সম্পূর্ণ একা হয়ে গেছে সে।

পোর্ট নোয়া ছাড়ার আগে শুধু জানত জুরিখে যেতে হবে ওকে। সেজন্যে ফ্রান্সের সীমান্ত পেরিয়ে সুইটজারল্যান্ডে ঢুকতে হবে। আরেকজনের পাসপোর্টের সাহায্যে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভোর হবার আগেই রাস্তা বের করে ফেলেছে সে। ডক্টর টুক্সবেরীর অনুমান নির্ভুল। কখন কি করতে হবে ও নিজেই তা বুঝতে পারছে এখন। কিন্তু কোত্থেকে সে পেল এই ক্ষমতা?

দ্রুত পোশাক পরে নিয়ে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা। পুবের আকাশ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। জন্ম নিচ্ছে আর একটা নতুন দিন।

সেইন্ট লরাঁর পাথরে বাঁধানো সরু সরু রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোতে ঢুঁ মেরে মেরে দোকানের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলতে থাকল সে। ক্যাপ্টেনের উপদেশমত চলতি ফরাসী ভাষাটা রপ্ত করে নিচ্ছে যতটুকু সম্ভব।

টাকার দরকার। ডাক্তারের দেয়া পুরো টাকাই যদি পাসপোর্টের ভোল পাল্টাতে খরচ হয়ে যায় তবে খুব শীঘ্রি আরও কিছু টাকার দরকার হবে ওর। মাথার মধ্যে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে টাকার চিন্তা।

ঘুরতে ঘুরতে শহরের অভিজাত এলাকায় চলে এল সে। এদিকের দোকানগুলো অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, জিনিসপত্রের দামও বেশি। কাঁচের ওপাশে সাজানো মাছ-মাংস আর তাজা শাকসব্জিগুলো চকচক করছে।

অনেকটা প্যারিস বা নিসের কোন বাজার-এলাকার মত।

একটা মাংসের দোকানে ঢুকল সে, দোকানি বিশেষ পাত্তা দিল না—সম্ভবত পোশাকে চাকচিক্যের অভাবের কারণে। এ মুহূর্তে সে ব্যস্ত আছে দু'জন খদ্দের নিয়ে। মাঝবয়েসী এক দম্পতি, পোশাক দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রচুর পয়সাকড়ির মালিক।

'গত সপ্তার গরুর মাংসটা ছিল একেবারে অখাদ্য, এমন শক্ত যে দাঁত বসানো যায় না,' কড়া গলায় গজগজ করছেন মহিলা, 'এরকম হলে আগামীবার মার্সেই থেকে অর্ডার দিয়ে আনাব, এখানে আর আসব না।'

'তাছাড়া ডেনি বলছিল তোমার পোর্ক চপগুলোও পাতলা,' ইন্দন জোগালেন ভদ্রলোক।

দোকানদার বার বার ক্ষমা চাইতে লাগল অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে। ভদ্রমহিলা এবার স্বামীর দিকে ফিরলেন, তারপর একইরকম কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'প্যাকেটগুলো গাড়িতে রেখে মুদিদোকানে চলে এসো, আমি ওখানে যাচ্ছি।'

মহিলা দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের হাবভাব বদলে গেল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে দোকানির দিকে বাড়িয়ে দিল, ঠোঁটে এক চিলতে হাসি, 'তারপর নিক, দিনকাল কেমন কাটছে?'

'এই তো, চলে যাচ্ছে,' সিগারেট নিতে নিতে বলল দোকানি, 'পোর্ক চপগুলো কি সত্যিই পাতলা ছিল?'

'আরে, না! পোর্ক চপের আকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাতে ডেনির বয়েই গেছে! আসলে, জানো তো, মানুষকে ধাতানি দিলে আমার স্ত্রী খুশি হয়।'

'ডেনি এখন কোথায়? আজ একবারও এদিকে আসেনি।'

'পাশের বারে মদে চুর হয়ে আছে। টুলন থেকে এক বেশ্যা আসবে, তার জন্যে অপেক্ষা করছে। জানো তো, বারের ওপরের ছোট্ট ঘরটা ব্যবহার করে সে। বিকেলে আবার আসতে হবে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে। ততক্ষণে একেবারেই অচেতন হয়ে পড়বে ব্যাটা, নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরতে পারবে না।'

এই সময় হঠাৎ করে ওর দিকে চোখ পড়ল দোকানদারের। 'কি? কি চাই?'

সদ্য শেখা চলতি ফরাসীটা গড়গড় করে নেবার সুযোগ এল। 'নিস থেকে আমার এক বন্ধু এই দোকানটার কথা বলে দিয়েছে, যাতে এখানে আসি।'

'ও, তাই নাকি?' এবার দোকানদারের আচরণে আগ্রহ দেখা দিল। পোশাক দেখে আজকাল খদ্দের চেনা মুশকিল। ছেঁড়া জিন্স আর রঙচটা পুরানো শার্ট তো এখন ফ্যাশন, ওরকমই কেউ হবে হয়ত। 'মহাশয়, আপনি কি এ এলাকায় নতুন এসেছেন?'

'আমার বোটের ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দিয়েছে, মেরামত হচ্ছে। আজ বিকেলে মার্সেই পৌঁছার কথা, তা আর হচ্ছে না।'

'আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'প্রচুর জিনিস দরকার। আধখানা গরু, গোটা দু'য়েক ভেড়া, ডজন দু'য়েক হাসের বাচ্চা আর চার ডজন হুইস্কির বোতল। বোটের শেফ এসে বিকেলে নিয়ে যাবে, তুমি শুধু প্যাকেট করে রেখো,' বলে সে পাশে দাঁড়ানো মাঝবয়েসী খদ্দেরের দিকে ফিরল। 'আচ্ছা, আপনারা কোন্ ডেনির কথা আলাপ করছিলেন? ডেনি বেলমার? আমার ছেলেবেলার বন্ধু, বহুদিন দেখা নেই।'

'না না,' ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ভদ্রলোকের। 'এ ডেনি বেলমার নয়, ডেনি পারিযো। বেচারার জীবনে বহু সমস্যা। বিবাহঘটিত, বুঝলেন মশাই, বিবাহঘটিত সমস্যা!'

'ও, ডেনি পারিযো! ওকেও তো আমি চিনি মনে হচ্ছে। বেঁটে মত, তাই না?'

'না, মশাই, বেঁটে নয়। রীতিমত লম্বা। আপনার সমানই হবে প্রায়।'

'তাই নাকি? যাই হোক, শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

বারের চারপাশে এবং ভেতরে জরিপ চালিয়ে ঢোকার আর বেরুবার পথগুলি চিনে নিল সে। বারের ঠিক সামনেই দামি একটা জাগুয়ার দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত ডেনি পারিযোর গাড়ি। আশেপাশে অন্য কোন বার নেই, ঠিক জায়গাতেই এসেছে সে। ওপরের খুপরি মত ঘরটাও দেখে এসেছে। বাথরুমে যাবার সরু সিঁড়ি ধরেই পৌঁছে যাওয়া যায় ঘরটাতে, কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। বারের উল্টোদিকে রাস্তার অপর পারে অপেক্ষা করতে লাগল সে, কাঁচের দেয়ালের ওধারে বারের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

একটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে মেয়েটা ট্যাক্সি থেকে নামল। এক নজরেই বোঝা যায় বারবনিতা। তবে সন্দেহ নেই সুন্দরী। সোনালী চুল, গায়ের সাথে সেঁটে থাকা পোশাকটা শেষ হয়ে গেছে হাঁটুর ফুটখানেক ওপরে, রোদে পোড়া চমৎকার লম্বা দুটো পা। ডেনি পারিযোর জীবনে অনেক সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে ব্যাটার রুচি আছে।

মেয়েটা কাউন্টারে বসে একটা ড্রিঙ্ক নিল। বিশ মিনিট পর

দোতলায় যাবার সরু সিঁড়িটার দিকে রওনা হল। ঠিক এক মিনিট পর গাঢ় রঙের জ্যাকেট আর ট্রাউজার পরা এক লোক মুখ নিচু করে টলমল পায়ে সিঁড়ির দিকে এগুলো। এই তাহলে ডেনি পারিযো! হাতে ঘড়ি নেই বলে বার বার পাশের দোকানে উঁকি দিয়ে সময় দেখে নিতে হচ্ছে। ডেনির হাতে যদি একটা ঘড়ি থাকে তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

কাপড়ের তৈরি ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে বারে ঢুকল সে। নাহ্, কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে না। ধীর পায়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হল। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওপরে। তাকে পাশ কাটিয়ে দোতলার ল্যান্ডিঙে চলে এল সে। আড়চোখে দেখল বৃদ্ধ প্যান্টের যিপার খুলতে খুলতে বাথরুমে ঢুকছে, ওর দিকে একবারও তাকাল না। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই দ্রুতপায়ে করিডরের শেষ মাথায় সরু বন্ধ দরজার মুখোমুখি দাঁড়াল।

কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই কাপড়ের তৈরি নরম ব্যাগটা দরজার ঠিক মাঝখানে চেপে ধরল। বাঁ হাতে ব্যাগটা চেপে ধরে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে গেল। তারপর বিদ্যুৎবেগে প্রচণ্ডশক্তিতে বাঁ কাঁধে ধাক্কা মারল ব্যাগে ঢাকা দরজার পাল্লায়। ভোঁতা শব্দ তুলে খুলে গেল দরজাটা, তড়িৎগতিতে ডান হাতে দরজার কিনারা ধরে ফেলল সে যাতে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে শব্দ না হয়।

মেয়েটা তারস্বরে চিৎকার করে উঠল।

'চুপ্!' ধমকে উঠল সে, দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ঘরের ভেতর। 'একদম চুপ্! কথামত কাজ করলে ভয়ের কিছু নেই।'

ডেনি পারিযো চমকে উঠে ঘুরে তাকাতে গিয়ে খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে। পরনে শুধু শার্ট আর টাই। মেয়েটা সম্পূর্ণ নগ্ন,

চাদরের নিচে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে।

'আমার বউ ভাড়া করেছে তোমাকে,' ককিয়ে উঠল ডেনি, 'কত দিয়েছে তোমাকে? আমি আরও বেশি দেব!'

'শার্ট আর টাই খুলে ফেলো,' ডেনির হাতের সোনালী ব্যান্ডের দিকে চোখ রেখে আরও যোগ করল, 'ঘড়িটাও।'

দু'মিনিটের মধ্যেই ডেনির পোশাক পরে ফেলল সে। জুতোটা একটু টাইট হয়েছে, তবে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। ডেনির ওয়ালেটে তেরো হাজার ফ্রাঁ পাওয়া গেল। গাড়ির চাবিটা ছিল প্যান্টের পকেটে।

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, আমার পোশাকগুলো অন্তত দিয়ে যাও!' প্রায় কেঁদে ফেলল ডেনি, ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে নেশা।

'খুবই দুঃখিত, সেটা সম্ভব নয়।' দু'হাতে ওর নিজের আর মেয়েটার পোশাকগুলো জড়ো করছে লোকটা।

'আমার পোশাক তুমি নিতে পারবে না।' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

'চ্যাঁচাতে নিষেধ করেছিলাম আগেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! কিন্তু...'

'চুপ!' ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বোলাল সে, জানালার পাশে ছোট্ট সাইড টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে ঝটকা মেরে তারটা ছিঁড়ে ফেলল। কাপড়চোপড়গুলো ব্যাগে পুরে দরজার দিকে এগুলো সে, 'এখন আর তোমাদেরকে কেউ বিরক্ত করবে না।'

'এত সহজে পার পাবে না,' পেছন থেকে শাসাল ডেনি, 'পুলিশ তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে।'

'পুলিশ?' ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল ঠোঁটের কোণে, 'তুমি কি

সত্যিই পুলিশ ডাকার কথা ভাবছ? পুরো পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে ফর্মাল রিপোর্ট দিতে হবে তোমাকে, সে কথা মনে আছে? আমার তো মনে হয় না তোমার বউ সেটা খুব পছন্দ করবে। আমার মনে হয় বিকেলে তোমার যে বন্ধু তোমাকে নিতে আসবে, তার জন্যে অপেক্ষা করাই ভাল। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

অচেনা দুষ্কৃতিকারী বিস্মিত ভীত ডেনি পারিযোর মুখের ওপর ভাঙা দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঠিকই বলেছিলেন ডক্টর টুক্সবেরী। কখন কি করতে হবে তা নিজেই বুঝতে পারছে সে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে ও জানল ঠিক কোথায় মারলে অচল হয়ে পড়বে আক্রমণকারী?, রিশের কর্মচারী দু'জনকে মারার কথা চিন্তাই করেনি ঘটনা ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তেও। অচেনা দু'জন লোকের কথাবার্তা থেকে কিভাবে সে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে পেল? শব্দ না করে দরজা ভাঙার কৌশলই বা কোথায় শিখেছে? বড় ধরনের একটা আইন বিরোধী কাজ করে এসেছে এইমাত্র, অথচ সেজন্যে কোনরকম বিবেক দংশন অনুভব করছে না। কোন ধরনের অতীত ওকে শিক্ষা দিয়েছে এ ধরনের দক্ষতা অর্জনে? ভাবতে গেলে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

জোর করে এলোমেলো চিন্তাগুলো দূর করে দিল মাথা থেকে। এ মুহূর্তে বর্তমানটাই বেশি জরুরি। ডেনির জাগুয়ার নিয়ে হাইওয়েতে চলে এসেছে ও। মেহগনি-মোড়া ড্যাশবোর্ডের যন্ত্রপাতিগুলো কেমন যেন অপরিচিত মনে হচ্ছে। বোতামগুলো চেপে চেপে পরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে কোনটা কি কাজ করে। তবে কি এ ধরনের গাড়ি সে আগে কখনও দেখেনি? ব্যাপারটা কি তাৎপর্যপূর্ণ?

এক ঘণ্টার মধ্যেই চওড়া একটা খালের ওপরে তৈরি ব্রিজ পার হল সে এবং বুঝতে পারল মার্সেই এসে গেছে। তার মানে এ শহর ওর পরিচিত। পাথরের তৈরি ছোট্ট ছোট্ট চৌকো বাড়ি, ইঁটের তৈরি ঘর রাস্তা আর শহরময় উঁচু দেয়ালের ছড়াছড়ি। সন্দেহ নেই এটা ওল্ড হারবারের শহরতলী। দূরে পাহাড়ের গায়ে বহু পুরানো একটা গির্জা, চূড়ার ভার্জিন মেরির মূর্তি এতদূর থেকেও চিনতে ভুল হয় না। 'নট্র-ডেম-ডে-লা-গার্ড'। হঠাৎ করেই গির্জার নামটা মনে পড়ে গেল! চমকে উঠল, এখানে আগেও এসেছে সে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহরের ব্যস্ত রাজপথে চলে এল জাগুয়ার, রাস্তার দু'পাশে দামি দোকানপাট, টিনটেড কাঁচের জানালাগুলো সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে, ফুটপাতে সুবেশী পথচারীর ভিড়। বাঁয়ে ঘুরে বন্দরের রাস্তা ধরল সে, ওয়্যারহাউস আর ছোট ছোট ফ্যাকট্রিগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা পার্কিংলট পছন্দ হল। পার্ক করা গাড়িগুলো নতুন আর দামি। এদের মধ্যে হঠাৎ করে জাগুয়ারটা চোখে পড়বে না। গাড়িটা পার্ক করে হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট্ট গ্যারাজের সামনে থামল। চারিদিক দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পাঁচ-ছ'জন মেকানিক কাজ করছে। স্ট্রাইপ স্যুট পরা রোগা এক লোককে মালিক বলে মনে হল। সহজাত প্রবৃত্তি ওকে বলে দিল এই লোকটার সঙ্গেই কথা বলতে হবে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ছয় হাজার ফ্রাঁর বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেল ডেনির জাগুয়ার। যদিও গাড়িটার আসল দাম এর ছয়গুণ বেশি। গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল। ড্রাইভারকে বলল সে একটা পন্—শপে যেতে চায়, যেখানে জিনিসপত্র বন্ধক রাখতে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না। এটা মার্সেই, ড্রাইভার ঠিকই বুঝতে

পারল লোকটা চোরাই জিনিস বিক্রি করতে চাচ্ছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিল তাকে। বিশ মিনিটের মধ্যে সে বন্ধকী-দোকান থেকে বেরিয়ে এল, বাঁ হাতের কব্জিতে ডেনির দামি রোলেক্সের বদলে একটা সেকো ক্রোনোগ্রাফ, পকেটে আরও আটশো ফ্রাঁ। রোলেক্স অনেক দামি আর সুন্দর হলেও ক্রোনোগ্রাফটা শকপ্রুফ—এটা বাড়তি লাভ।

এরপর বড়সড় একটা ডিপার্টমেন্ট-স্টোরে ঢুকল সে। তিন সেট রুচিশীল দামি পোশাক কিনল, ট্রায়াল রুমে পড়ে রইল ডেনির পোশাকগুলো। চামড়ার একটা স্যুটকেসও কিনল। সদ্য কেনা একটা সবুজে-ছাই স্যুট পরনে, বাকি কাপড়গুলো স্যুটকেসে গুছিয়ে রাখল. কাপড়ের ব্যাগটাও ঢুকল স্যুটকেসে। বাঁ হাতের নতুন ঘড়িটায় সময় দেখল, প্রায় পাঁচটা বেজে গেছে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। একটা কিছু খেয়ে নিয়ে মাঝারি ধরনের একটা হোটেল খুঁজে বের করতে হবে। রু্য সারাসিনের ক্যাফেতে যাবার আগে কিছুটা বিশ্রাম দরকার।

রু্য সারাসিন মার্সেইয়ের প্রাচীন রাস্তাগুলোর একটা। ছোট্ট, দু'শো ফুটের বেশি লম্বা নয়, দু'পাশে পাথরের দেয়াল আর ঘুপচি রেস্তোরাঁ। রাস্তার দু'পাশে আলোর কোন ব্যবস্থা নেই. বরং বন্দরের দিক থেকে ভেসে আসা কুয়াশা এই অন্ধকার জায়গাটাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। গোপন সাক্ষাৎকারের জন্যে রু্য সারাসিনের চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

অন্ধকার রাস্তার মাঝামাঝি ক্যাফে স্যুই শ্যালে, জানালায় আলো দেখে সহজেই চেনা যায়। ভেতরটা গিজ গিজ করছে খদ্দেরের ভিড়ে, সিগারেটের ধোঁয়ায় শ্বাস নেয়া ভার। একপাশে পর্দাঘেরা ছোট ছোট

বুদ, গোপনীয়তার ব্যবস্থা। মিনিট পাঁচেক মাতাল নাবিক আর উৎসাহী বারবনিতাদের ভিড়ে ঘুরে বেড়ানর পর ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেল সে, কোণের একটা টেবিলে বসে আছে, সঙ্গে রোগামত বেঁটে এক লোক।

'বসো,' নিচু গলায় বলল ক্যাপ্টেন। 'ভেবেছিলাম আরও আগেই আসবে।'

'আপনি বলেছিলেন ন'টা থেকে এগারোটা। এখন ঠিক পৌনে এগারোটা,' চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল সে।

'যাই হোক, এতক্ষণ বসে বসে হুইস্কি গিলতে হল, পয়সাটা তুমি দেবে।'

'অবশ্যই। ইচ্ছে হলে ভাল কিছুও খেতে পারেন।'

রোগা ছোটখাট লোকটার সরু গোঁফের নিচে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। নিশ্চিন্ত হল সে, লোকটা ভোগাবে না।

সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি কাজের কথা হয়ে গেল।

'কত দিতে হবে?' প্রশ্ন করল সে।

'অনেক খাটনি, যন্ত্রপাতি আনতে হবে ভাড়া করে। আড়াই হাজার ফ্রাঁ।'

'কখন পাবো পাসপোর্টটা?'

'ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে করতে হয়, শিল্পী যেভাবে ছবি আঁকে ঠিক সেভাবে। তিন-চারদিন তো লাগবেই। তাড়াহুড়ো করতে বললে আমাদের শিল্পী খেপে যাবে।'

'আগামীকাল ডেলিভারি দিতে পারলে আরও হাজার ফ্রাঁ।'

'সকাল দশটায়,' সরু গোঁফের নিচে হাসিটা বিস্তৃত হয়েছে দু'কান পর্যন্ত। 'ব্যাটাকে রাজী করাব যে করেই হোক।'

'এত টাকা কোথায় পেলে?' তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করতে করতে ক্যাপ্টেন জানতে চাইল, 'পোর্ট নোয়া থেকে কি নিয়ে এসেছিলে, হীরে?'

'না, বুদ্ধি,' হাসল সে।

'একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি দরকার,' দ্রুত কাজের কথায় ফিরে এল রোগা লোকটা।

'এখানে আসার পথে আর্কেডে থেমে একটা ছবি তুলেছি,' পকেট থেকে ছবিটা বের করে এগিয়ে দিল সে।

পানীয়ের বিল মিটিয়ে ক্যাপ্টেনের হাতে অগ্রিম পাঁচশো ফ্রাঁ চালান করে দিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ক্যাফে থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। কাল সকালে কোথায় দেখা হবে সেটাও ঠিক করা হয়েছে। ক্যাফের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল, ভেতরে সিগারেটের ধোঁয়ায় দম আটকে আসছিল এতক্ষণ।

বিদ্যুৎচমকের মত ঘটে গেল ঘটনাটা, চিন্তা করার কোন সময় পেল না সে।

অন্ধকারে কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগল, লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চাইল খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চিমসেমত ছোকরা। পরমুহূর্তেই ওর মুখের দিকে চেয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল ছেলেটার চোখ দুটো, হাঁ হয়ে গেল মুখটা। একই সঙ্গে অবিশ্বাস, বিস্ময় আর আতঙ্ক ফুটে উঠেছে হাসের ডিমের মত গোল গোল চোখে।

'না! হায় খোদা, না! এ হতেই পারে না...' চিৎকার করতে করতে ছেলেটা পিছু ফিরে দৌড়াতে শুরু করল।

চিতাবাঘের মত লাফিয়ে ছেলেটার কাঁধ খামচে ধরল সে, 'অ্যাই, দাঁড়াও। ব্যাপারটা কি?'

কাঁধ থেকে হাতটা ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে ছোকরা আর পাগলের মত চ্যাঁচাচ্ছে, 'তুমি! তুমি তো মরে গেছ! কোনভাবেই বেঁচে থাকতে পারো না! মরে গেছ! তুমি মরে গেছ!'

'আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু তুমি কেমন করে জানো?'

ঘৃণায় দু'সারি হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, হঠাৎ করেই হাঁটুর কাছ থেকে একটা ছুরি বের করে আনল ছেলেটা, 'তবে আমিই তোকে শেষ করব!'

ছুরিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ পা ঘুরিয়ে ছেলেটার তলপেটে জোর লাথি ঝেড়েছে, রাস্তার মাঝখানে ছিটকে পড়েছে দেহটা। আশেপাশের আতঙ্কিত পথচারীরা সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে। দু' একজন চাপা স্বরে মন্তব্য করছে, 'অন্য কোথাও চলে যাও, বাছারা!' 'যত্তসব ঝামেলা!' 'পুলিশ এলে কিন্তু ভাল হবে না!'

বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল আহত ছেলেটা, কিন্তু আক্রমণের চেষ্টা না করে দু'হাতে পেট চেপে ধরে দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল নিমেষে। বাঁ হাতে এখনও ধরে আছে ছুরিটা।

যারা এতদিন ধরে ওকে মৃত ভেবেছে বা আশা করেছে ও মরে গেছে, তারা এখন জানে ও বেঁচে আছে!

চার

জুরিখ-গামী এয়ার ফ্রান্সের দরজা পার হয়ে ইকনমি ক্লাসে ঢুকতেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল। যাত্রী বোঝাই প্লেন, ঘিঞ্জি সীটগুলোর মাঝে এক চিলতে গলি, বাচ্চারা তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে। জানালার পাশেই ওর সীট, পাশের যাত্রী দু'জনকে ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হল। বসার পরেও অস্বস্তিটা কাটল না।

প্লেন টেক-অফ করার পর অস্বস্তিটা বাড়তে বাড়তে রীতিমত আতঙ্কে পরিণত হল। জানালার বাইরে পেঁজা পেঁজা তুলোর মত মেঘের ভিড় ওর অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে, ধূসর আকাশের নিদারুণ শূন্যতা চুম্বকের মত টানছে! ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

চারপাশে অন্ধকার। বাতাসের প্রচণ্ড চাপে চোখ খুলে রাখা দায়, অনবরত শোঁ শোঁ শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। বাতাসের ঘর্ষণে বাঁ গালটা জ্বলছে, মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে গালের চামড়া উঠে যাবে। বাঁ হাতটা উপরে তুলল···গ্লাভ পরা আঙুলগুলো দরজার কিনারা আঁকড়ে ধরল, ডান হাতে ধরে আছে একটা···একটা স্ট্র্যাপ! একটা স্ট্র্যাপ ধরে কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে সে। কিসের জন্যে? সিগন্যাল? ফ্ল্যাশ লাইটের ঝলকানি? অথবা কাঁধে একটা টোকা? নির্দেশ পেতেই নিচের অন্ধকারে ঝাঁপ দিল। নিঃসীম শূন্যতায়

ওলটপালট খেতে খেতে দেহটা পড়ে যাচ্ছে নিচে! প্যারাস্যুট! প্যারাস্যুটে লাফ দিয়েছে সে!

'মঁশিয়ে, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

কেটে গেল দুঃস্বপ্নের মত ঘোরটা। দু'হাত মাথার ওপর তুলে সোজা হয়ে বসে আছে সে সীটে, ঘামে ভিজে গেছে শরীর। পাশের সীটে বসা লোকটা ওর বাহু ধরে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে।

'পার্দো, মঁশিয়ে,' ফরাসী ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করল সে। হাত দুটো নামিয়ে নিয়ে প্রাণপণে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে, আঙুলগুলো এখনও শক্ত হয়ে আছে, মুঠো খুলছে না। 'মাঝে মাঝে এরকম হয়। ও কিছু না, এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে,' পাশের লোকটাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

সন্দেহ নেই প্লেন থেকে প্যারাস্যুটে লাফ দিয়েছে সে অতীতে। প্লেনে চড়তে হঠাৎ করেই সেই স্মৃতি মনে পড়ে গিয়েছে। অভিজ্ঞতাটা এমনই বাস্তব যে এখনও বুকটা ধুকধুক করছে। প্যারাস্যুট! কবে? কোথায়? কেন?

জোর করে অন্যদিকে মনোযোগ ফেরাবার চেষ্টা করল সে। পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে আর একবার উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে শুরু করল। টুক্সবেরী নামটা পাল্টানো হয়নি, কারণ এ নামের কোন লোকের জন্যে পুলিশের হুলিয়া নেই। শুধু ক্লিফর্ড নামটা পরিবর্তন করে চার্লস্ বানানো হয়েছে, আর ইনিশিয়ালের 'আর'-টাকে 'পি'-তে পরিণত করা হয়েছে। ক্লিফর্ড. আর. টুক্সবেরী এখন চার্লস. পি. টুক্সবেরী। রাস্তার পাশের আর্কেডে তোলা ওর ছবিটাতে তুলির আঁচড় পড়েছে, যে কোন ভাল দোকানে তোলা ছবির মতই মনে হচ্ছে। আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারগুলোও নতুন, ইমিগ্রেশনের কম্পিউটার

ধরতে পারবে না। মোট কথা ভুয়া পাসপোর্ট বলে মনেই হয় না। কিন্তু কতদিন এই নকল পরিচয়পত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে? পোর্ট নোয়া ছেড়ে আসার সময় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল জুরিখেই রয়েছে সব প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু জুরিখে পৌছাবার আগেই রহস্য ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। স্যুই শ্যালের সামনে ছেলেটা কে ছিল? কেন ওকে মারতে চাচ্ছিল? মার্সেইতে কিছু কিছু জায়গা খুব পরিচিত মনে হয়েছে, কিন্তু ছেলেটাকে একটুও পরিচিত মনে হয়নি। কেন যেন মনে হচ্ছে আগে দেখে থাকলে ছেলেটাকে ঠিকই চিনতে পারত সে। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে অপরিচিত একজন লোক কেন শুধু শুধু ওকে মারতে চাইবে?

এয়াপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল। ওকে ফরাসী ট্যুরিস্ট ধরে নিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে জিজ্ঞেস করল, 'জুরিখে স্বাগতম, মঁশিয়ে। কোথায় যাবেন?'

কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই ও বলল, 'হোটেল ক্যারিলন দ্যু লাক।' বলেই অবাক হয়ে গেল, কোত্থেকে এই নামটা জেনেছে সে? প্লেনে আসার সময় সামনের সীটের পেছনের পকেট থেকে কয়েকটা ফোল্ডার বের করে উল্টেপাল্টে দেখছিল, সবই জুরিখ শহরের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বর্ণনা সম্বলিত। ওখানেই কোথাও পড়েছে হোটেলটার নাম?

হোটেলের সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ভুল ভাঙল। এ হোটেলের নাম কোন ফোল্ডারে দেখেনি, এ হোটেল ওর বড় পরিচিত। লালের ওপর হলুদ ফুলকাটা পুরু কার্পেট, লবিতে সাজানো তাজা গাছসহ পেতলের বিশাল সব টব, বার্নিশ করা কাঠের তৈরি মূল্যবান

আসবাবপত্র—সবকিছুই ওর চেনা। বিশাল কাঁচের দেয়ালের ওপাশে ঝকঝক করছে ঐশ্বর্যময়ী লেক জুরিখ। মার্বেলের তৈরি এই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কতদিন সে উপভোগ করেছে প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য! কিন্তু কবে? কখন?

ডেস্কে রিসেপশনিস্টের উষ্ণ অভ্যর্থনা শুনে মনে আর কোন সন্দেহ রইল না, 'কেমন আছেন, স্যার? বহুদিন এদিকে আসেননি!'

বহুদিন! কতদিন! লোকটা ওকে চেনে। কান্নায় ভরে গেল বুকের ভেতরটা, দৌড়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে সুবেশী সুদর্শন হোটেল-কর্মচারী ওই যুবককে। আকুল হয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে, 'কেন আপনি আমার নাম ধরে ডাকছেন না? খোদার দোহাই লাগে শুধু একবার আমার নাম ধরে ডাকুন! আমি আপনাকে চিনতে পারছি না! আমি যে নিজেই নিজেকে চিনতে পারছি না! আমাকে বাঁচান! দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন!'

কার্যত খুকখুক করে গলা পরিষ্কার করে শান্তকণ্ঠে সে বলল, 'এদিকে কাজ পড়েনি বহুদিন। আচ্ছা, আমার একটা উপকার করতে পারেন? কনভেয়ার বেল্ট থেকে লাগেজ নামাতে গিয়ে আঙুলে চোট পেয়েছি, লিখতে অসুবিধা হচ্ছে। যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনি রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা পূরণ করে দিন, আমি সই করে দিচ্ছি।' বলেই মনে হল, ব্যাটা যদি নামের বানান জানতে চায়!

'অবশ্যই! অবশ্যই!' কার্ডটা টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল রিসেপশনিস্ট। 'যদি দরকার মনে করেন তাহলে হোটেলের ডাক্তারকে খবর দিতে পারি।'

'পরে, এখন নয়। যদি ব্যথা বাড়ে তাহলে আপনাকে জানাব।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল সে।

লেখা শেষ করে হাসিমুখে কার্ডটা বাড়িয়ে দিল যুবক ওর সইয়ের জন্যে।

মি. এ. কেইন। নিউ ইয়র্ক। ইউ. এস. এ।

প্রতিটা শব্দ বিস্ফোরণের মত আঘাত করতে থাকল ওর স্নায়ুতন্ত্রে। পুরো নাম নয়, নামের শেষ অংশ। এ. কেইন। ইনিশিয়ালের 'এ'-তে কি বোঝায়? অ্যালেন? অ্যান্ড্রু? আর্থার? যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক সে, থাকে নিউ ইয়র্কে!

'কোথাও ভুল হয়েছে, হের কেইন?'

'ভুল? না না, সব ঠিকঠাক আছে,' বলতে বলতে কলম তুলে নিল সে, কাল্পনিক ব্যথায় চোখ কোঁচকাতেও ভুলল না। কিন্তু কিভাবে সই করবে? ভাবার সময় নেই, রিসেপশনিস্ট যেভাবে লিখেছে সেভাবেই টানা হাতে সই করল—এ. কেইন।

নামটা লিখতে গিয়ে অন্তরের অন্তস্তলে কোনরকম আবেগ অনুভব করল না এ. কেইন। নাহ্! নামটা একটুও পরিচিত মনে হচ্ছে না।

'খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম বুঝি লিখতে গিয়ে কিছু ভুল করে ফেলেছি,' কাঁচুমাচু হয়ে বলল রিসেপশনিস্ট। 'পুরো হপ্তাটা খুব ব্যস্ত যাচ্ছে তো! অবশ্য যত ব্যস্তই থাকি, আপনার নাম-ঠিকানা তো আর ভুলে যেতে পারি না, হের কেইন।'

'আপনার স্মরণশক্তির ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে···হের ফ্রিৎস্,' ছেলেটার ব্লেজারে আঁটা নেম-ট্যাগ দেখে নিয়ে বলল কেইন।

'ধন্যবাদ, হের কেইন,' বলে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে এল সে, 'তাহলে আগের নির্দেশমতই সব ব্যবস্থা থাকবে?'

'হ্যাঁ···মোটামুটি আগের মতই থাকবে,' সতর্ক হল সে। 'আচ্ছা, ঠিক কি কি নির্দেশ দিয়েছিলাম, বলুন তো?'

নামতা পড়ার মত আওড়াতে শুরু করল ছেলেটা, 'যদি কেউ ফোনে আপনাকে চায়, তাহলে বলতে হবে আপনি বাইরে গেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাতে হবে। শুধু নিউ ইয়র্ক থেকে আপনার কম্পানির ফোন এলেই দেরি না করে রুমে কানেকশন দিতে হবে। কম্পানির নাম—যতদূর মনে পড়ে—ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান কর্পোরেশন।'

আর একটা নাম! নিউ ইয়র্কের নাম্বার, অপারেটরকে দিয়ে সহজেই বের করে ফেলা যাবে। অবশেষে প্রশ্নের উত্তর মিলতে শুরু করেছে!

'হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। আপনি সত্যিই খুব কাজের লোক।'

'ধন্যবাদ, হের কেইন। আপনাদের মত অতিথি পাই বলেই তো খেয়েপরে বেঁচে আছি,' বলে গলা তুলে বেলবয়কে ডাকল ছেলেটা।

স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগুলো বেলবয়। রিসেপশনিস্টের উদ্দেশ্যে মৃদু হাত নেড়ে পিছু নিল কেইন, ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে মাথায়। ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান কর্পোরেশনের কর্মচারী সে! জুরিখে এলে কারও সঙ্গে দেখা করে না। কিন্তু কেন? কি ধরনের চাকরি করে সে?

অপারেটর কোন সাহায্য করতে পারল না। যান্ত্রিক সুরে সে শুধু বলে চলল, 'এ নামে লিস্টে কোন কম্পানি নেই, স্যার। ব্যক্তিগত লাইনগুলোও চেক করে দেখেছি, কোন ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান কর্পোরেশন নেই।'

'হয়ত সাময়িকভাবে লাইন কাটা হয়েছে…হয়ত…হয়ত ঠিকানা বদলেছে বলে…'

'না, স্যার। আমি নিশ্চিত এ নামে কোন কম্পানি নেই। আপনার

ভুলও হতে পারে। কি ধরনের কম্পানি যদি বলতে পারেন তবে কাছাকাছি নামের জায়গাগুলোতে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'দুঃখিত, শুধু নামটাই জানি। ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান, নিউ ইয়র্ক সিটি।'

'নিউ ইয়র্ক সিটিতে এ নামে কোন কম্পানি নেই, স্যার। অন্তত গত পাঁচ বছরের মধ্যে ছিল না।'

'সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, ম্যা'ম।' ফোনটা নামিয়ে রাখল কেইন। চেষ্টা করার জন্যে আর কোন পথ খোলা নেই। যতদূর মনে হয় নামটা কোন ধরনের কোড। শুধুমাত্র এদের সঙ্গেই ওর যোগাযোগ রাখার কথা, তাই রিসেপশনে এই কাল্পনিক নামটা দেয়া হয়েছে কলটা চিহ্নিত করার জন্যে। এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাহলে কি নিউ ইয়র্কের ব্যাপারটাও ভুয়া? ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান কি এই জুরিখেই আছে?

ড্রয়ার থেকে ডেনির ওয়ালেটটা বের করে পকেটে রাখল কেইন। বাঁ হাতে পরল সেকো ক্রোনোগ্রাফ। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজের চেহারাটা। তারপর বলে উঠল, 'তুমি এ. কেইন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা আর এই মুহূর্তে তোমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কয়েকটা সংখ্যা—জেরো সেভেন—সেভেনটি টুয়েলভ—জেরো ফোরটিন—টোয়েন্টি সিক্স জেরো।'

হলদে নরম রোদ ধুয়ে দিচ্ছে ব্যানহফস্ট্রাসের দু'পাশের কাঁচমোড়া আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোকে। জুরিখের ব্যাঙ্কগুলোর বেশির ভাগই এই ব্যানহফস্ট্রাসেতে। দিনটা বড় সুন্দর। রাস্তার পাশের ছোট ছোট

পার্কগুলোতে বর্ণালী ফুলের মেলা। বারকিল প্লায-এর পাশ দিয়ে যাবার সময় নিচে লেক জুরিখ ঝিঁকিয়ে উঠল। নিজের অজান্তেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়ল কেইন, জায়গাটা বড় পরিচিত মনে হচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, কোন স্মৃতি নেই!

কেন যেন মনে হচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে বেশি দূরে চলে এসেছে ও, ফিরতি পথ ধরল দ্বিধা না করেই। ব্যানহফস্ট্রাসের মোড়টা ঘুরতে হালকা হলুদ পাথরের তৈরি বাড়িটা ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দিল। গেমেইনশ্যাফ্‌ট ব্যাঙ্ক! চিনতে একটুও ভুল হল না। সামনে এসে সাইনবোর্ডটা দেখল। ঠিকই আছে, এটাই গেমেইনশ্যাফ্‌ট ব্যাঙ্ক। কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল কেইন। পায়ের নিচে বাদামী রঙের মার্বেলের মেঝে। আগেও এখানে এসেছিল সে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু মনে পড়ছে না কেন?

অস্বস্তিকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিটা রোমকূপে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল কেইন। কেন যেন মনে হচ্ছে এখানে ওর আসার কথা নয়। ভেতর থেকে কেউ নিষেধ করছে। কিন্তু এখন আর তা হয় না।

'বোঁ যোর, মঁশিয়ে,' ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কেইনের পোশাক দেখে ফরাসীতে অভিবাদন জানাল, 'আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাই, খুবই জরুরি ব্যবসায়িক কাজ।' লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে ইচ্ছে করেই ইংরেজিতে কথা বলল কেইন।

'পারডন, স্যার,' বিস্ময়ের ভঙ্গিতে ভুরু দুটো একটু ওপরে উঠে গেল, আর একবার কেইনের আপাদমস্তক জরিপ করে নিল সে। 'বাঁ

দিকের এলিভেটর নিয়ে দোতলায় উঠে যান। ওখানে একজন রিসেপশনিস্ট আছে, সেই আপনাকে সাহায্য করবে।'

দোতলার রিসেপশনিস্ট একজন মাঝবয়েসী লম্বা-চওড়া লোক, ছোট করে ছাঁটা চুল খুলির সঙ্গে সেঁটে রয়েছে, চোখে কাছিমের খোলের চশমা। কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আমাদের সঙ্গে বর্তমানে আপনার কি কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'দয়া করে এখানে একটা সই করে দিন,' ব্যাঙ্কের নাম-ঠিকানা লেখা ছোট একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল লোকটা, নিচে পরপর দুটো লাইন টানা।

বুঝতে অসুবিধে হয় না নাম লেখার দরকার নেই, শুধু নাম্বারগুলো লিখে দিতে হবে। নাম্বারগুলোই সই হিসেবে কাজ করে। সুইস ব্যাঙ্কের সাধারণ নিয়ম। এখানে নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

একটানে নাম্বারগুলো লিখে দিল কেইন, একটুও হাত কাঁপল না। কার্ডটা চোখের সামনে তুলে ধরে পড়ল রিসেপশনিস্ট, তারপর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডান দিকের চার নাম্বার ঘরে অপেক্ষা করুন, দশ মিনিটের মধ্যেই একজন অফিসার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'চার নাম্বার ঘর?'

'চার নাম্বার। ভেতরে ঢুকলে দরজাটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তার কি আদৌ কোন দরকার আছে?'

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল রিসেপশনিস্ট, 'এটা আপনারই দেয়া শর্তাবলীর একটা ধারা। এটা একটা তিন শূন্য অ্যাকাউন্ট, স্যার। আসার আগে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ফোন করে আসাই নিয়ম।'

'আমি জানি,' মিথ্যে বলতে একটুও গলা কাঁপল না কেইনের, 'হঠাৎ করেই দরকার পড়ে গেল।'

'ঠিক আছে, আপনি অপেক্ষা করুন। আমি এটা ভেরিফিকেশনের জন্যে পাঠাচ্ছি।'

চমকে উঠল কেইন, 'ভেরিফিকেশন?'

'সিগনেচার ভেরিফিকেশন, স্যার।' এক পা সামনে এগিয়ে ডেস্ক ঘেঁসে দাঁড়াল রিসেপশনিস্ট, ডান হাতের তর্জনী আলতো ভাবে ছুঁয়ে আছে লাল একটা বোতাম। 'আপনি চার নাম্বার ঘরে উপেক্ষা করুন।' অনুরোধ নয়, এটা স্পষ্ট আদেশ। কাছিমের খোলের চশমার ওপাশে চোখ দুটোতে মেকি ভদ্রতা মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে কর্তৃত্বের ছাপ।

'একটু তাড়াতাড়ি করতে বলুন,' বলতে বলতে চার নাম্বার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল কেইন। ক্লিক্ শব্দ তুলে দরজার লক্ বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি। ঘষা কাঁচের দেয়াল, ভাল করে লক্ষ করল কাঁচের ভেতর সূক্ষ্ম তারগুলো দেখা যায়। তারমানে দেয়ালে ফাটল ধরলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে।

ভেতরের আসবাবপত্র খুবই রুচিশীল। এক পাশে দামি কাঠের টি-টেব্‌লের উল্টোদিকে একজোড়া চামড়া-মোড়া কাউচ। উল্টোদিকের দেয়ালে ছাই রঙা ইস্পাতের দরজা। টেবিলের ওপর তিনটে ভাষায় প্রকাশিত পৃথিবীর বিখ্যাত সব পত্র-পত্রিকা। কাউচে বসে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হেরাল্ড-ট্রিবিউন তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করল কেইন। পড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু মাথায় কিছু ঢুকছে না। মন পড়ে আছে দরজার দিকে।

অবশেষে ইস্পাতের দরজা খুলে লম্বা সুদর্শন দামি স্যুট পরা এক

লোক ভেতরে ঢুকল, এক নজরেই বোঝা যায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী। 'পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। দেরির জন্যে ক্ষমা চাইছি, একটু ঝামেলা হয়ে গেল।' মার্জিত ইংরেজি।

'ঝামেলা?'

'আপনি হের হ্যানসেলকে ঘাবড়ে দিয়েছেন। আগে না জানিয়ে তিন-শূন্য অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা ব্যাঙ্কে আসেন না। হের হ্যানসেল খুবই সাবধানী লোক, তাতে আমাদেরই সুবিধা। যাই হোক, আমি আর্নল্ড গ্রাভিস। দয়া করে ভেতরে আসুন।' ইস্পাতের দরজাটা খুলে ধরলেন ভদ্রলোক। অন্য হাতে হ্যান্ডশেক করলেন।

তেকোনা ছোট ঘরটার দেয়াল আর ছাদ গাঢ় ছাই রঙা, পুরু কাঁচের জানালার নিচে ব্যস্ত ব্যানহফস্ট্রাসে, জানালার পাশেই চওড়া ডেস্ক, মুখোমুখি দুটো চেয়ার।

'ভদ্রলোককে ঘাবড়ে দেবার জন্যে দুঃখিত,' শান্ত কণ্ঠে বলল কেইন। 'আসলে আমি খুবই ব্যস্ত, ফোন করে আসার সময় পাইনি।'

'সে আমি বুঝতে পারছি,' ঘুরে ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে বসতে বসতে গ্রাভিস ওকে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন, 'বসুন। আর একটা কাজ বাকি আছে, তারপরই আমরা কথা বলব।' একটা সাদা ক্লিপবোর্ড বাড়িয়ে দিলেন তিনি। তাতে একটা কাগজ আটকানো। দুটো নয়, পরপর দশটা লাইন টানা আছে কাগজে। 'দয়া করে পাঁচবার সই করুন এখানে।'.

'কিন্তু···কেন? একটু আগেই তো সই করলাম!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সেটা ঠিকই আছে। ভেরিফাই করে দেখা হয়েছে।'

'তাহলে আবার কেন সই করতে হবে?'

'গ্রাফোলজিক্যাল স্ক্যানারে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। অতিরিক্ত

সাবধানতা আরকি! হের হ্যানসেলের চাপাচাপিতেই এটা করতে হচ্ছে। আপনার চিন্তার কিছু নেই।'

'ভদ্রলোক দারুণ সাবধানী দেখছি!' কলম তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করল কেইন। চার বার নাম্বারগুলো লেখার পরই গ্রাভিস বাধা দিল।

'ব্যস্ ব্যস্। ওতেই হবে। সময় নষ্ট করে কি লাভ! ভেরিফিকেশনে একশো ভাগ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, সুতরাং সন্দেহের কিছু নেই। স্ক্যানের রিপোর্ট পেলেই আমরা শুরু করব।' হাত বাড়িয়ে ক্লিপবোর্ডটা নিয়ে কাগজটা খুলে ডেস্কের ডানদিকে একটা স্লটে ঢুকিয়ে দিলেন গ্রাভিস। একটা বোতাম চাপ দিতেই স্লটের ভেতর বিদ্যুৎচমকের মত আলো খেলে গেল। 'সইগুলো এখান থেকে সরাসরি স্ক্যানারে ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি এর কোন দরকার নেই। অনাহূত কোন লোক এতদূর আসতে সাহস করবে না।'

'কেন, এত কিছুর পর এইটুকু ঝুঁকি নেয়া এমন কি কঠিন ব্যাপার?'

'লক্ষ করেছেন তো এ ঘরে একটামাত্র দরজা। আপনি তো জানেনই বাইরের দরজাটা লক্ হয়ে গেছে।'

'তাছাড়া কাঁচের দেয়ালের ভেতরে আছে অ্যালার্ম সিস্টেম,' যোগ করল কেইন।

'তারমানে আপনি সমঝদার লোক। বুঝতেই পারছেন ফালতু কোন লোক এখান থেকে পালাতে পারবে না।'

'ধরুন সেই লোকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।'

'আপনার কাছে নেই, এটুকু জানি,' হেসে ফেললেন গ্রাভিস।

অবাক হল কেইন, 'কেমন করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন? আমাকে তো কেউ সার্চ করেনি!'

'এলিভেটরে স্ক্যানার বসানো আছে। চারটে ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে

আপনাকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, আপনি নিরস্ত্র। যদি অস্ত্র থাকতো তবে মাঝপথেই থেমে যেত এলিভেটর।'

'আপনাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

'আপনাদের কথা চিন্তা করেই সবধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।' এসময় টেবিলের ওপর ফোনটা আর্তনাদ করে উঠলে রিসিভার তুললেন গ্রাভিস। 'ইয়েস?... ঠিক আছে, ভেতরে এসো।' কেইনের দিকে তাকালেন, 'আপনার অ্যাকাউন্টের ফাইল তৈরি।'

'এত তাড়াতাড়ি?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেইন।

'হের হ্যানসেল আগেই সই করে দিয়েছেন, এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল শুধু স্ক্যানারের রিপোর্টের জন্যে।' ড্রয়ার খুলে একটা চাবির রিঙ বের করলেন গ্রাভিস। 'আমি নিশ্চিত হের হ্যানসেল খুবই নিরাশ হয়েছেন।'

ইস্পাতের দরজা খুলে রিসেপশনিস্ট—হ্যানসেল—ঘরে ঢুকল। হাতে ধাতুর তৈরি কালো একটা বাক্স। রূপোর ট্রেতে দুটো গ্লাস আর একবোতল মিনারেল ওয়াটারের পাশে রাখল সে বাক্সটা। বোতলের গায়ের লেবেল পড়ল কেইন—'পেরিয়ে'—পরিচিত ব্র্যান্ড।

'জুরিখে সময় কেমন কাটছে?' নীরবতা ভাঙার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন গ্রাভিস।

'দারুণ। হোটেলে আমার ঘরটা লেকের ঠিক ওপরে। ওপর থেকে চমৎকার দেখায় লেকটা।'

বোতল থেকে মিনারেল ওয়াটার গ্লাসে ঢালতে লাগলেন গ্রাভিস। হ্যানসেল দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আপনার অ্যাকাউন্ট, স্যার,' চাবির রিঙ থেকে একটা চাবি বের করে কেইনের দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। 'আপনি চাইলে তালাটা

আমি খুলে দিতে পারি।'

'খুলুন। দেখি সব ঠিকঠাক আছে কিনা।'

'স্যার, আমি শুধু তালাটাই খুলতে পারি,' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন গ্রাভিস, 'ভেতরের জিনিস দেখার অধিকার আমার নেই।'

'কেন?'

'আপনি হয়ত চাইবেন না আমি আপনার পরিচয় জেনে ফেলি। রেস্ট্রিকশন না থাকলে ফাইলের ওপরেই আপনার নাম থাকবে।'

'যদি এখান থেকে কিছু টাকা অন্য কারও নামে ট্রান্সফার করতে চাই?'

'তার জন্যে আপনার সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিচয়টাই যথেষ্ট। উইথড্রল স্লিপে পুরো সইটা দরকার হবে, আর কিছু নয়।'

'যদি সুইটজারল্যান্ডের বাইরে কোন ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করতে চাই?'

'তাহলে নামটা জানার প্রয়োজন পড়বে, আপনার এবং আমাদের নিরাপত্তার খাতিরে।'

'তাহলে আপনিই খুলুন।'

বাক্সটা টেনে নিলেন গ্রাভিস। শ্বাস বন্ধ করে চেয়ে রইল কেইন, তলপেট থেকে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা উঠে আসছে ওপরের দিকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালে। পেপারক্লিপ দিয়ে আটকানো একগোছা কাগজ বের হল বাক্স থেকে। ওপরের পৃষ্ঠার নিচের দিকে চোখ বুলাতেই গ্রাভিসের চোখের পাতা কেঁপে উঠল, কুঁচকে গেল ঠোঁটের কোণ। কাগজের গোছা কেইনের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি।

ভাষাটা ইংরেজি, সেটাই স্বাভাবিক। ওপরে অ্যাকাউন্ট নাম্বার লেখা। নামের জায়গাটায় লেখা আছে 'সংরক্ষিত'। তার নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—'ভিন্ন একটা খামে নাম-ঠিকানা রয়েছে, একমাত্র

অ্যাকাউন্ট হোল্ডারই খামটা খুলতে পারবে'। সবচেয়ে শেষে রয়েছে টাকার একটা অঙ্ক, অ্যাকাউন্টের বর্তমান ব্যালেন্স। পাথরের মত জমে গেল কেইন— ৭,৫০০,০০০ ফ্রাঁ।

আর যাই হোক, এরকম কিছু সে আশা করেনি। এতক্ষণের চেপে রাখা নিঃশ্বাস দাঁতের ফাঁকে শীস কেটে বেরিয়ে এল। ডাক্তার টুক্সবেরীর বাড়িতে জ্ঞান ফিরে পাবার পর এই প্রথম উপলব্ধি করল সত্যিকারের ভয় কাকে বলে। ডলারে হিসেব করলে পাঁচ মিলিয়ন আমেরিকান ডলারের মালিক সে এখন।

কিন্তু, কেমন করে? কেন?

কাঁপা হাতে পাতা উল্টে প্রথম থেকে স্টেটমেন্টগুলো পড়তে শুরু করল কেইন। প্রতি দেড় থেকে দুমাস অন্তর অ্যাকাউন্টে বড় বড় অঙ্কের টাকা জমা হয়েছে। কোন অঙ্কই ৩০০,০০০ ফ্রাঁর কম নয়। বছর তিনেক আগে খোলা হয়েছে অ্যাকাউন্টটা। সিঙ্গাপুরের এক ব্যাঙ্ক থেকে দু'মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ট্রান্সফারের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের লেনদেন শুরু হয়। স্টেটমেন্টের ভেতর থেকে হলুদ রঙের একটা খাম বেরিয়ে এল। চারদিকে কালো বর্ডার দেয়া। ওপরে লেখা আছে— 'পরিচয়পত্রঃ ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান কর্পোরেশনের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে খোলা নিষেধ।'

'আমি কি এটা খুলে দেখতে পারি?' কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল কেইন।

'এটা আপনারই সম্পত্তি, নিষেধাজ্ঞাটা আপনি ছাড়া আর সবার জন্যে প্রযোজ্য। চিন্তা করবেন না, যেভাবে রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই আছে। কেউ হাত দেয়নি।'

খামের উল্টোদিকে গেমেইনশ্যাফট ব্যাঙ্কের নিজস্ব সীল আস্তই

আছে, ভাঙা হয়নি। খামের মুখটা ছিঁড়ে ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করল কেইন। রুদ্ধশ্বাসে পড়ে নিল কালো হরফে টাইপ করা শব্দগুলোঃ

অ্যাকাউন্ট হোল্ডারঃ অ্যালেক্সান্ডার টমাস কেইন
ঠিকানাঃ অনির্ধারিত
নাগরিকত্বঃ ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অফ আমেরিকা

অ্যালেক্সান্ডার টমাস কেইন!

অ্যালেক্সান্ডার! অ্যালেক্স!

ইনিশিয়ালের 'এ'-টা তাহলে অ্যালেকজান্ডার। 'কেইন' নামটা ওর মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি, অন্য যে কোন নামের মতই অর্থহীন মনে হচ্ছিল। এখন 'অ্যালেক্সান্ডারে'র সঙ্গে মিলে পুরো নামটা যেন অবয়ব পেতে শুরু করেছে। নিজের নাম বলে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে না। অ্যালেক্সান্ডার টমাস কেইন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু জানার পরেও কেন উত্তেজনাটা কমছে না? একটু আগের ভয়টা কেন এমন রক্তহিমকরা আতঙ্কে পরিণত হচ্ছে? কেন মনে হচ্ছে যে তিমির থেকে সে এসেছে আবার সেই তিমিরেই কেউ ওকে নিক্ষেপ করেছে?

'সবকিছু ঠিক আছে তো, স্যার?' উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস্ করলেন গ্রাভিস।

'হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। হের গ্রাভিস, আমার নাম কেইন, অ্যালেক্সান্ডার কেইন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, হের কেইন। কথা দিতে পারি আপনার পরিচয় এই চার দেয়ালের বাইরে যাবে না।'

'ধন্যবাদ। এখন তাহলে কাজ শুরু করা যাক। বেশ কিছু টাকা

বাইরে ট্রান্সফার করতে চাই, দয়া করে সব ব্যবস্থা করুন।' এক হাতে মিনারেল ওয়াটারের গ্লাস তুলে নিল অ্যালেক্স।

মার্সেইয়ের এক ব্যাঙ্কের একটা কোডেড অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হল ১,৫০০,০০০ সুইস ফ্রাঁ। টাকাটা ডাক্তার টুক্সবেরীর জন্যে। অ্যাকাউন্টের কোড পোর্ট-নোয়ায় ডাক্তারের কাছে পৌঁছে যাবে যথাসময়ে। মার্সেইতে এসে কোড দেখালেই ডাক্তার টাকাটা তুলে নিতে পারবেন। টাকার অঙ্কটা দেখার পর ডাক্তারের চেহারা কেমন হতে পারে তা ভেবে অ্যালেক্সের হাসি পেল। এক মিলিয়ন ডলারেরও কিছু বেশি হবে। ইচ্ছে করলে ডাক্তার এই টাকা নিয়ে লন্ডনে ফিরে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারেন। অথবা নেশার পেছনেও উড়িয়ে দিতে পারেন—সেটা তাঁর ইচ্ছে।

এরপর প্যারিসের রু্য মেডেলিনের এক ব্যাঙ্কে অ্যালেক্সান্ডার টি. কেইনের নামে ট্রান্সফার করা হল ৪,৫০০,০০০ ফ্রাঁ। টাকাটা গেমেইনশ্যাফ্‌ট্ ব্যাঙ্কের নিয়মিত সাপ্তাহিক পাউচে করে যাবে সিগনেচার-কার্ড সহ। হ্যানসেল আশ্বাস দিল তিনদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

সবশেষে বড় বড় নোটে এক লাখ ফ্রাঁ ক্যাশ করে নিল অ্যালেক্স ওর সংখ্যাতাত্ত্বিক সইয়ের মাধ্যমে। সবকিছুর পর অ্যাকাউন্টে রইল ১,৪০০,০০০ সুইস ফ্রাঁ—এখনও যথেষ্ট বড় অঙ্কটা।

সব মিলে সোয়া একঘণ্টা লাগল। ফাইল আনা-নেয়ার কাজে গ্রাভিসকে সাহায্য করল হ্যানসেল। নির্বিঘ্নে কেটে গেল সময়টুকু। মাঝে শুধু একবার হ্যানসেল একটা কালো বর্ডার দেয়া খাম এনে গ্রাভিসের হাতে দিল। ভেতরের বার্তাটুকু পড়ে গ্রাভিসের চোখে

দুশ্চিন্তার ছায়া খেলে গেল, গম্ভীর স্বরে হ্যানসেলকে বললেন, 'যেভাবে বলা আছে সেভাবেই হবে।' বেরিয়ে গেল হ্যানসেল।

'কোন সমস্যা?' সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল অ্যালেক্স।

'না না! আমাদের নিজস্ব ব্যাপার, আপনার কোন সমস্যা নেই,' হেসে ওকে আশ্বস্ত করলেন গ্রাভিস।

গ্রাভিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘষা কাঁচের দরজা ঠেলে লবিতে বেরিয়ে এল অ্যালেক্স, ক্লিক শব্দ তুলে পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। হ্যানসেল বসে আছে ডেস্কের পেছনে নিজের আসনে। লবির অন্য প্রান্তে দুটো চেয়ারে বসে আছে আরও দুজন লোক। কারা এরা? যদি কাজে এসে থাকে তাহলে হ্যানসেলের সাথে কথা না বলে ওখানে বসে রয়েছে কেন? হ্যানসেলের সঙ্গে যদি আগেই কথা হয়ে থাকে তবে এখন ওদের থাকার কথা ঘষা কাঁচের ওধারের কোন একটা ঘরে। এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে বোতামে চাপ দিল অ্যালেক্স।

আড়চোখে দেখে হ্যানসেল ওদের দিকে ইঙ্গিত করল মাথা ঝাঁকিয়ে। লম্বা চওড়া লোক দু'জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এলিভেটরের দরজা খুলে যাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াল অ্যালেক্স। ডানদিকের লোকটার হাতে একটা রেডিও, মুখের কাছে নিয়ে নিচু স্বরে কিছু বলে উঠল। বাঁ দিকের লোকটার ডান হাত পরনের রেইনকোটের ভেতরে। হাতটা বেরিয়ে আসতেই কালো রঙের পয়েন্ট থ্রী এইট ক্যালিবারের অটোমেটিক পিস্তলটা দৃশ্যমান হল, বিকটদর্শন একটা সাইলেন্সারও লাগানো আছে। দৌড়ে আসছে ওরা।

পাঁচ

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এলিভেটরের দরজা, রেডিওওয়ালা ঢুকে পড়েছে ভেতরে। পিস্তলওয়ালা বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে দুটো পাল্লার মাঝখানে। নিমেষে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল।

কোনরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই বিদ্যুৎ খেলে গেল অ্যালেক্সের শরীরে। ডান দিকে হেলান দিয়ে বাঁ পা'টা অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল, শরীরটা ঘুরে গেল আধপাক। মাঝপথে পা'টা আঘাত করল দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দেয়া পিস্তলধরা হাতটার গোড়ায়। দুপ দুপ করে পরপর দু'বার শব্দ হল, এলিভেটরের সিলিঙে ঢুকেছে গুলি দুটো। ছিটকে পেছনে পড়ে গেছে লোকটা। বন্ধ হয়ে গেছে এলিভেটরের দরজা। সেজন্যে থেমে রইল না সময়, উড়ে গিয়ে পড়ল অ্যালেক্স রেডিওওয়ালা লোকটার ওপর। অ্যালেক্সের কাঁধ লোকটার তলপেটে আঘাত করল, এক হাতে বুক খামচে ধরেছে, অন্য হাতে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে রেডিওধরা হাতটা। রেডিওটা ছিটকে পড়ল মেঝেয়, স্পিকারে কারও গলার স্বর ভেসে এল—'আঁরি? সা ভা?' ফরাসীতে কেউ জিজ্ঞেস করছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

রেডিওওয়ালার নাম তাহলে আঁরি—'হেনরি'র ফরাসী উচ্চারণ। এরা ফরাসী! ক্যাফে স্যুই শ্যালের সামনে ছুরি হাতে ফরাসী ছোকরা

ওর বেঁচে থাকার খবর যথাস্থানে পৌঁছে দিতে একটু দেরি করেনি!

পুরো ঘটনাটা ঘটে যেতে দু'সেকেন্ডের বেশি লাগল না। রেডিওওয়ালা এতই অবাক হয়েছে যে আর্তনাদ করতেও ভুলে গেছে! লোকটাকে ওর সামনে নিয়ে এল অ্যালেক্স, বাঁ হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে গলা, ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে মুচড়ে ধরেছে একটা কান।

'নিচে ক'জন অপেক্ষা করছে?' ফরাসীতে জিজ্ঞেস করল অ্যালেক্স। নিচে নামছে এলিভেটর।

'নিজেই গিয়ে গুনে দ্যাখ্, শুয়োরের বাচ্চা!'

নিচের দিকে চাপ দিয়ে মাথাটা এলিভেটরের পেতলের দেয়ালে ঠুকে দিল অ্যালেক্স, কানটা গোড়া থেকে অর্ধেক ছিঁড়ে এসেছে। বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল আঁরি। উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ছে মেঝেতে। এক ঝটকায় ওকে চিৎ করে দিল অ্যালেক্স। বুকের ওপর হাঁটু রেখে চেপে ধরল মেঝের সঙ্গে। হাঁটুতে হোলস্টারের স্পর্শ পেতেই হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার বের করে আনল, লক্ষ করল সাইলেন্সার লাগানো নেই। বাইরে থেকে কেউ নিশ্চয়ই এলিভেটরের স্ক্যানার অকেজো করে রেখেছে, তা নাহলে এলিভেটর বন্ধ হয়ে যেত। নিশ্চয়ই হ্যানসেলের কাজ।

'উত্তর না দিলে খুলি উড়িয়ে দেব,' রিভলভারের নল ওর মাথায় ঠেকিয়ে গর্জে উঠল অ্যালেক্স।

'দু'জন। একজন এলিভেটরের সামনে, অন্যজন বাইরে ফুটপাতে গাড়ির পাশে।'

'কি রকম গাড়ি?'

'পিগট।'

'রঙ?' কমে এসেছে এলিভেটরের গতি, পৌঁছে গেছে নিচ তলায়।

'কালো।'

'এলিভেটরের সামনে যে আছে সে কি পরে আছে?'

'জানি না...'

রিভলভারের বাঁট দিয়ে চাঁদিতে মাঝারি ধরনের একটা কোপ বসাল অ্যালেক্স, 'মনে করার চেষ্টা করো।'

'কালো কোট পরে আছে!'

থেমে গেল এলিভেটর। আঁরির কোটের কলার ধরে দাঁড় করিয়ে দিল অ্যালেক্স। খুলে গেল দরজা। বাঁ দিকে দাঁড়ানো কালো রেইনকোট পরা এক লোক নড়ে উঠল, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। পরমুহূর্তেই আঁরির গলা বেয়ে নেমে আসা রক্তের স্রোত লক্ষ করে সতর্ক ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গেল। বাঁ হাতটা রেইনকোটের পকেটে, বিপদজনক ভঙ্গিতে পকেটসহই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আর একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল!

আঁরির শরীরটা বর্মের মত সামনে ধরে রেখে এলিভেটর থেকে বের হল অ্যালেক্স। খুক খুক কাশির মত তিনটে শব্দ হল। শেষবারের মত আর্তনাদ করে ঢলে পড়ল আঁরি মার্বেলের মেঝেতে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন এক মহিলা, পুলিশ! পুলিশ! করে ছুটোছুটি করতে থাকল আশেপাশের লোকজন।

অ্যালেক্স জানে আঁরির সাইলেন্সারহীন রিভলভারটা সে ব্যবহার করতে পারবে না এই জনবহুল লবিতে, করলে এত লোকের মাঝখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। রিভলভারটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিল আলগোছে। সবচেয়ে কাছে যে লোকটা ছিল, তার দুকাঁধ আঁকড়ে ধরে ছুঁড়ে ফেলল খুনীর গায়ের ওপর।

সদর দরজা লক্ষ্য করে দৌড়াল আলেক্স। সিকিওরিটি গার্ড হাতে

পিস্তল নিয়ে দরজা পাহারা দিচ্ছে, কেউ বেরুতে পারছে না। ফলে দরজার সামনে বড়সড় একটা জটলার সৃষ্টি হয়েছে। ঢোকার সময় যে লোকটা ওকে ফরাসী ভেবে স্মার্টনেস দেখাবার চেষ্টা করেছিল সে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো টেলিফোনে কথা বলছে।

'সোনালী ফ্রেমের চশমা পরা লোকটা!' টেলিফোন-ধরা লোকটার উদ্দেশ্যে চ্যাঁচাল আলেক্স, 'ওই লোকটাই গুলি করেছে! আমি দেখেছি!'

'কি? কে আপনি?'

'আমি আর্নল্ড গ্রাভিসের বন্ধু! দয়া করে লোকটাকে ধরুন! চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, গায়ে কালো রেইনকোট। ওই যে, ওখানে!'

কৌশলটা কাজে লাগল। ওপরওয়ালার নাম শুনে মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড় লাগাল লোকটা, ফোনটা তারের সঙ্গে ঝুলছে। ছুটতে ছুটতে সিকিওরিটি গার্ডের উদ্দেশ্যে চ্যাঁচাচ্ছে, 'চশমা চোখে একটা লোককে ধরতে হবে! তাড়াতাড়ি!'

'ইয়েস, স্যার!' গার্ডও ওর পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে।

নির্বিঘ্নে দরজার সামনে পৌঁছে গেল অ্যালেক্স। কাঁচের পাল্লা ঠেলে বাইরে পা রাখতে একটু ইতস্তত করল, যে কোন মুহূর্তে একটা গুলি ছুটে আসতে পারে। আঁরি বলেছিল বাইরেও একজন আছে। পেছনে এক নজর তাকিয়ে দেখল কালো রেইনকোট পরা লোকটার চোখে এখন আর সোনালী ফ্রেমের চশমা নেই, চারিদিকের ছুটোছুটি করতে থাকা লোকজনের তুলনায় ধীর পায়ে মাথা নিচু করে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসছে, সিকিওরিটি গার্ড তাকে পেছনে ফেলে দৌড়ে চলে যাচ্ছে আরও দূরে। দরজার বাইরে ফুটপাতে ছোটখাট একটা জটলা, উৎসুক পথচারীরা উঁকিঝুঁকি মারছে। ধীরগতিতে জটলাটা পার হয়ে ফুটপাত

ধরে দৌড়াল আলেক্স। একটা দোকানের সামনে সাত/আটজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাঙ্কে কি হচ্ছে তা নিয়ে গবেষণায় রত। অ্যালেক্স ওদের মধ্যে মিশে গিয়ে ব্যাঙ্কের সামনের রাস্তায় চোখ বুলাল। আঁরি মিথ্যে বলেনি। কালো পিগটটা পার্ক করা আছে ব্যাঙ্কের ঠিক সামনে, দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, রেইনকোটের পকেটে হাত। পনেরো সেকেন্ড পর কালো রেইনকোট পরা লোকটা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিল এই লোকটার সঙ্গে, পকেট থেকে সোনালী ফ্রেমের চশমাটা বের করে পরতে শুরু করেছে। নিজেদের মধ্যে দ্রুত কথাবার্তা বলতে বলতে উদ্বেগপূর্ণ চোখে রাস্তার দুদিক জরিপ করছে—খুঁজছে অ্যালেক্সকে।

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পিগটের পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে অ্যালেক্সের চেহারা চেনে না। গোলমালের পর সিকিওরিটি ব্যারিকেড পেরিয়ে একমাত্র ওই ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, অথচ বাইরে অপেক্ষমাণ লোকটা চোখের সামনে দেখেও ওকে গুলি করেনি। তারমানে ওকে চিনতে পারেনি লোকটা।

সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ-কার হাজির হল। খুনী লোকটা হতাশার ভঙ্গিতে গা থেকে রেইনকোট খুলে নিয়ে পিগটের পেছনের সীটে ছুঁড়ে দিল। অন্যজন ড্রাইভার'স সীটে উঠে ইঞ্জিন চালু করেছে, হুশ করে ব্যানহফস্ট্রাসে ধরে গাড়ির ভিড়ে মিশে গেল পিগট। খুনী এবার যা করল তা অ্যালেক্স কল্পনাও করেনি। চোখ থেকে চশমা খুলে পকেটে ভরতে ভরতে পুলিশের পেছন পেছন দরজা ঠেলে ব্যাঙ্কে ঢুকে গেল।

সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জুরিখ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। খালি একটা ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে দৌড়াল অ্যালেক্স। কেন একদল খুনী ওকে মারতে চাইছে?

*

হোটেল ক্যারিলন দ্যু লাকের রিসেপশনে নতুন এক লোক। ফ্রিৎস্‌কে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। তাই না থেমে একেবারে ওর রুমে চলে এল অ্যালেক্স। স্যুটকেস থেকে কাপড়চোপড় বের করেনি সে, বাথরুম থেকে শেভিঙ কিটটা এনে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে নিয়েই যাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল। আঁরির কাছ থেকে পাওয়া রিভলভারটা পরীক্ষা করে নিল দ্রুত। তারপর ডেস্কে বসে ছোট্ট একটা চিরকুট লিখল হোটেলের ছাপওয়ালা প্যাডে।

হের ফ্রিৎস্‌,

জরুরি দরকারে হঠাৎ করেই চলে যেতে হল। আমার কাছে কেউ এলে বা ফোন করলে দয়া করে তার নাম আর ফোন নাম্বার টুকে রাখবেন। আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

অ্যালেক্সানডার কেইন

কোনরকম সূত্র হাতছাড়া করতে চায় না ও, ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান থেকে ওরা যোগাযোগ করতে পারে। সেজন্যেই ফ্রিৎস্‌কে অনুরোধ করা। পাঁচশো ফ্রাঁর একটা নোটের সঙ্গে চিরকুটটা ভাঁজ করে হোটেলের মনোগ্রাম আঁকা খামে ঢুকিয়ে মুখটা আটকে দিল। স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল অ্যালেক্স। বার বার পেছন ফিরে দেখছে। নাহ্! কেউ নেই।

টুং শব্দ করে দরজার মাথায় লাল আলো জ্বলে উঠল। এসে গেছে এলিভেটর। দরজার পাল্লা দু'দিকে সরে যেতে সতর্ক ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল অ্যালেক্স। ভেতরে দু'জন ভদ্রলোক, আর এক মহিলা—নিজেদের মধ্যে ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলছে। কারও বয়েসই ত্রিশ-বত্রিশের

বেশি নয়। মহিলা তো রীতিমত সুন্দরী। লালচে-বাদামী চকচকে চুল কাঁধ ছাঁড়িয়ে বেশ কিছুটা নিচে ছড়িয়ে পড়েছে, অপূর্ব একজোড়া বাদামী চোখ, মসৃণ উজ্জ্বল ত্বক—চোখেমুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। পরনে সমুদ্র-নীল চমৎকার রুচিশীল পোশাক।

'তুমি কি কালই চলে যাচ্ছ্ নাকি?' বাঁ দিকের লোকটা জিজ্ঞেস করছে মেয়েটাকে।

'এখনও জানি না, অটোয়ার সঙ্গে কথা না বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না,' রিনরিনে মিষ্টি স্বরে বলল মেয়েটা, 'লিয়নে আমার আত্মীয় আছে, দেখা করে যেতে পারলে ভালই হত।'

'আমার তো মনে হচ্ছে কনফারেন্স আরও পাঁচ দিনেও শেষ হবে না। প্রত্যেক সেশনেই দু'একজন করে বক্তা বাদ পড়ে গেছে সময়ের অভাবে। এতদূর থেকে এসে পেপার না পড়ে কেউ ফিরতে চাইবে?' ডানদিকের ভদ্রলোক বললেন।

'না, ব্রাসেল্‌স্ অনুমতি দেবে না। হোটেলের খরচ কুলাতে পারবে না, ঠিক সময়েই শেষ হয়ে যাবে কনফারেন্স,' বলতে বলতে প্রথমজন মেয়েটার দিকে ফিরলেন, 'মিশেল, তোমার গতকালের পেপারটা দারুণ হয়েছিল কিন্তু। ফ্রী-ট্রেডের ওপর এমন সুন্দর আলোচনা কেউই করতে পারেননি।'

'এমন আর কি। গৎবাঁধা বুলি, আসলে পেপারটার পেছনে একদম সময় দেইনি,' বলে হাসল মিশেল।

এলিভেটরের গতি কমে এসেছে, পৌঁছে গেছে নিচে।

'উঃ! ভাবতেই বিরক্তি লাগছে এখন পাসকেল বুড়োর ঘুমপাড়ানী ঘ্যাঙঘ্যাঙানি শুনতে হবে পুরো দুটো ঘণ্টা!' আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করলেন ভদ্রলোক, 'চলো, তিনজনে মিলে পিছনের সারিতে বসে লম্বা

একটা ঘুম দেই। প্রোজেক্টার চালাবে বুড়ো, ঘর অন্ধকার থাকবে, কেউ টের পাবে না।' ফাঁক হতে শুরু করেছে এলিভেটরের দরজা।

'তোমরা যাও,' হেসে বলল মেয়েটা, 'আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি, অটোয়ায় টেলেক্স পাঠাতে হবে।'

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে লোক দু'জন বাঁ দিকে লবি ধরে চলে গেল, মেয়েটা এগুলো রিসেপশনের দিকে। লবির এক প্রান্তে বিরাট একটা বোর্ড টাঙানো আছে, তাতে বড় বড় করে লেখাঃ

'ষষ্ঠ বিশ্ব-অর্থনীতি-সম্মেলনে স্বাগতম'।

নিচে আজকের অনুষ্ঠানসূচীর বর্ণনা। ঢোকার সময় বোর্ডটা দেখেছিল অ্যালেক্স, কিন্তু লেখাগুলো পড়েনি।

'রুম নাম্বার পাঁচশো সাত। অপারেটর বলল, আমার জন্যে একটা টেলেক্স এসেছে,' রিসেপশনিস্টের উদ্দেশ্যে বলল মেয়েটা। অ্যালেক্স দাঁড়িয়ে আছে ওর ঠিক পেছনে।

ইংরেজি। মেয়েটা ইংরেজিতে কথা বলছে এখন। অথচ এতক্ষণ ফরাসীতে কথা বলেছে। অটোয়ার কথা বলছিল, তারমানে মেয়েটা কেনেডিয়ান। সম্ভবত ফ্রেঞ্চ-কেনেডিয়ান।

পেছনের সুট পরীক্ষা করে একটা কাগজ হাতে ঘুরে দাঁড়াল রিসেপশনিস্ট, 'মিশেল ডিয়ন?'

'হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ,' কাগজটা হাতে নিয়ে দু'পা সরে গেল মিশেল।

রিসেপশনিস্ট অ্যালেক্সের দিকে তাকাল, 'ইয়েস, স্যার?'

'ফ্রিৎসের জন্যে আমি একটা মেসেজ রেখে যেতে চাই,' মুখ বন্ধ করা খামটা বাড়িয়ে দিল অ্যালেক্স।

'ফ্রিৎস তো সকাল ছ'টার আগে আসবে না। কিছু দরকার হলে

আমাকে বলতে পারেন, স্যার।'

'না না, ধন্যবাদ শুধু দেখবেন খামটা যেন ও পায়। সকালে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

স্যুটকেস তুলে নিয়ে সদর দরজার দিকে রওনা হল অ্যালেক্স। সময় নেই। দ্রুত কেটে পড়তে হবে। বাইরে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে একে একে, সন্ধ্যা নেমে আসছে। জুরিখ থেকে ইউরোপের সব বড় বড় শহরে ফ্লাইট রয়েছে মধ্যরাত পর্যন্ত, ওগুলোর কোন একটা ধরতে হবে।

হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না অ্যালেক্স। কাঁচের দরজার ওপাশে হোটেলের পর্চে এসে থামল কালো রঙের পিগট, সোনালী ফ্রেমের চশমা চোখে লাফিয়ে নামল ব্যাঙ্কের সেই খুনী, অন্যদিকের দরজা খুলে বের হল আরও একজন। পিগট চালাচ্ছিল যে লোকটা, সে নয়। এ হল আঁরির সঙ্গী, গেমেইনশ্যাফট ব্যাঙ্কের এলিভেটরে ঢোকার সময় যাকে মেরে বের করে দিয়েছিল সে। দ্রুতপায়ে দরজার দিকে রওনা হয়েছে ওরা, রেইনকোটের পকেট দুটো ভারি—এতদূর থেকেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

এত তাড়াতাড়ি ওরা কেমন করে জানল কোন হোটেলে উঠেছে ও? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল ব্যাঙ্কে গ্রাভিস জিজ্ঞেস করছিল জুরিখে ওর কেমন সময় কাটছে। উত্তরে সে বলেছিল লেকের ঠিক ওপরেই ওর হোটেল-রুম, চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। হ্যানসেল তখন সামনেই ছিল। কোন সন্দেহ নেই হ্যানসেলই ওদেরকে জানিয়েছে। লেকের ধারে ক'টা হোটেলইবা আর আছে জুরিখে? দুটো...না না, তিনটে।

একে একে নামগুলো মনে পড়ে যেতে থাকল—ক্যারিলন দ্যু লাক, বাওয়ার অউ লাক আর এডেন অউ লাক আশ্চর্য! নামগুলো কেমন করে মনে পড়ে গেল! অবশ্য আরও দু'একটা ছোটখাট হোটেল থাকতে পারে, তবে গেমেইনশ্যাফট ব্যাঙ্কে যার তিন-শূন্য অ্যাকাউন্ট আছে সে তো আর এলেবেলে হোটেলে উঠবে না! রাগে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে—কেমন করে এতবড় বোকামি করল সে!

সময় নেই। বাইরে থেকে ওরা দেখে ফেলেছে ওকে। সামনের দরজা দিয়ে বের হবার কোন উপায় নেই। এতবড় হোটেল, নিশ্চয়ই আরও অনেক পথ রয়েছে কিন্তু কোন দিকে? এমনও তো হতে পারে প্রতিটা দরজায় পাহারা বসিয়েছে ওরা। সেটাই স্বাভাবিক। ঘুরে লবি ধরে দ্রুতগতিতে হাঁটতে শুরু করল অ্যালেক্স। এত লোকের মধ্যে ওরা কি সত্যিই গুলি ছোঁড়ার সাহস করবে? নিশ্চয়ই করবে। গেমেইনশ্যাফট ব্যাঙ্কে সে চেষ্টাই করেছিল তারা। ও যদি এখন চিৎকার করে? পুলিশ ডাকে? হোটেলের কর্মচারীদের সাহায্য চায়? ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা জানে অ্যালেক্স তা করবে না। অর্থাৎ পুলিশের কাছে যেতে ওর বাধা আছে। কেন? অ্যালেক্স কি আইনের চোখে অপরাধী? হায় আল্লাহ্, নিশ্চয়ই তাই!

পিছু ফিরে দেখল ওরা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ছে। দু'জনেরই ডান হাত কোটের পকেটে। বুকে ট্যাগ আঁটা প্রায় শ'দুয়েক ডেলিগেট লবিতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে, এরা কনফারেন্সে এসেছে। ভিড় ঠেলে এগুতে বেগ পেতে হচ্ছে ওদের।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল অ্যালেক্স। ডানদিকের করিডরের মুখে ভিড়টা ঘন বলে সেঁধিয়ে গেল সেদিকে। এক ঝলক পিছু ফিরে দেখল লবির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা খুঁজছে ওকে। সময় নেই, যা করার

তাড়াতাড়ি করতে হবে।

দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট একটা বুদ, পরিচিত সমুদ্র-নীল সিল্কের পোশাকের কিছুটা অংশ আর লালচে-বাদামী চুলের আভাস চিনতে ভুল হয় না। এলিভেটরে দেখা মেয়েটা, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে ওর দিকে পেছন ফিরে কিছু একটা করছে। এলিভেটরে সঙ্গীদেরকে বলছিল অটোয়ায় টেলেক্স পাঠাতে হবে, তাই করছে সম্ভবত। ভিড় ঠেলে দ্রুত মেয়েটার পেছনে চলে এল অ্যালেক্স। মেয়েটা সঙ্গীদের বলছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই সেমিনারে ওদের সঙ্গে দেখা করবে, প্রোজেক্টার চলবে—ঘরটা অন্ধকার থাকবে। ঠিক এরকম একটা জায়গাই অ্যালেক্সের দরকার। কি যেন নাম মেয়েটার? মিশেল···হ্যাঁ, মিশেলই তো!

'মিশেল···?'

'আই বেগ ইওর পারডন?' বিস্মিত চোখে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা।

'আপনিই তো মিশেল···' বলতে বলতে সতর্ক চোখে ভিড়টা জরিপ করছে অ্যালেক্স, কণ্ঠে জরুরি ভাব।

'মিশেল ডিয়ন,' অবাক হয়ে মেয়েটা ওর আপাদমস্তক দেখে নিল। 'আপনি তো এলিভেটরে ছিলেন!'

'হতে পারে, খেয়াল করিনি। একজন বলল আপনি জানেন পাসকেল কোন রুমে বক্তৃতা করছেন। যদি দয়া করে দেখিয়ে দেন···'

'ওই তো, বোর্ডেই লেখা রয়েছে। স্যুইট নাম্বার সাত।'

'রুমটা আমি চিনি না, যদি আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন···' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল অ্যালেক্স, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন।,আমি পত্রিকার রিপোর্টার, বক্তৃতার কোন অংশ বাদ দিতে চাই না।'

'আপনাকে রুমটা দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ভেতরে নিয়ে যেতে

পারব না, আমার কাজ আছে,' বিরক্ত হয়েছে মেয়েটা।

'দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন!'

'কি?' অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল মিশেল।

'মানে, বলছিলাম কি···বক্তৃতা তো শুরু হয়ে গেছে···' ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে খুনী লোক দুটো, চঞ্চল হয়ে উঠল অ্যালেক্স।

'অদ্ভুত লোক তো আপনি!' ঝাঁঝিয়ে উঠে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল মিশেল সাত নাম্বার স্যুইটের উদ্দেশ্যে।

করিডরে ভিড় একটু কম। সদ্য শেষ হওয়া সেশনগুলো থেকে ডেলিগেটরা বেরিয়ে লবিতে ভিড় করেছে পরের সেশনের অপেক্ষায়। লাল কার্পেটে মোড়া করিডরের দু'দিকে কনফারেন্স রুমগুলো। প্রতিটা রুমের দরজায় নাম্বার লেখা। শেষ প্রান্তের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মিশেল।

'এই যে, এই দরজাটা দিয়ে ভেতরে চলে যান। সাবধানে ঢুকবেন, ভেতরে প্রোজেক্টার চালানো হচ্ছে বলে অন্ধকার।'

'রুমের পেছনদিকে কি কোন দরজা আছে?' বারবার পেছন ফিরে দেখছে অ্যালেক্স, ঝড়ের গতিতে মাথার ভেতর চিন্তা চলছে। প্রোজেক্টার আর যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই সামনের দরজা দিয়ে ঢোকানো হয়নি, তারমানে ঘরের পেছনদিকে আর একটা দরজা থাকার সম্ভাবনা।

'আমি জানি না,' বিরক্তির ভঙ্গিতে সুন্দর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। 'অনেক কাজ পড়ে আছে, আমি এবার যাই।'

স্যুটকেসটা কার্পেটে নামিয়ে রেখে দ্রুতহাতে মিশেলের ডান কনুই ধরে ফেলল অ্যালেক্স। চমকে ঘুরে তাকাল মেয়েটা, 'কি অসভ্যতা করছেন!' ব্যক্তিত্বপূর্ণ কঠিন গলায় ধমকে উঠল।

'আপনাকে ভয় দেখাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু

আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে,' শক্ত হাতে মেয়েটার কনুই চেপে ধরে সামনে নিয়ে এল অ্যালেক্স, করিডোরের মুখে চলে এসেছে অনুসরণকারীরা।

'কি যা তা বলছেন!' ভয় পেয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল মেয়েটা।

বাঁ হাতে পকেট থেকে রিভলভার বের করে মেয়েটার পাঁজরে চেপে ধরল অ্যালেক্স, 'চুপ করে যা বলছি শুনুন। হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছি আমি, আপনি সাহায্য করবেন। আপনার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই। বাইরে বেরুতে পারলেই আপনাকে ছেড়ে দেব।'

'মাই গড!' ককিয়ে উঠল মেয়েটা।

ডান হাতে ওকে আঁকড়ে ধরে সাত নাম্বার স্যুইটে ঢুকে পড়ল অ্যালেক্স। অন্ধকারে দু'এক সেকেন্ড চোখে কিছুই দেখতে পেল না। উল্টোদিকের দেয়ালে আলোকোজ্জ্বল স্কিনে কিসের যেন গ্রাফের ছবি, স্পিকারে কেউ সেটা ব্যাখ্যা করছে। নিশ্চয়ই পাসকেল। প্রোজেক্টারের আলো শুধু স্কিনটাকে আলোকিত করেছে, ঘরের বাকি অংশ অন্ধকার। চেয়ারে বসা দর্শকদের কালো কালো মাথার সারি দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে।

হঠাৎ করে স্কিনটাও অন্ধকার হয়ে গেল। স্লাইডটা খুলে নেয়া হয়েছে, নতুন আর একটা স্লাইড দেখানো হবে। ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে। মেয়েটাকে ঠেলতে ঠেলতে সব চেয়ে পেছনের সারিতে ঢুকে পড়ল অ্যালেক্স, দেয়ালের দিকে সরে যেতে চাইছে।

'মিশেল! আমরা এদিকে!' বাঁ দিক থেকে কেউ ফিসফিস করে ডেকে উঠল, সম্ভবত এলিভেটরে দেখা মেয়েটার সঙ্গী দু'জন।

রিভলভারের নলটা মেয়েটার পাঁজরে চেপে ধরল অ্যালেক্স, ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'পরে কথা হবে, আমি একটু ব্যস্ত!' ভাগ্যিস, অন্ধকারে মেয়েটার মুখ দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

'এই তাহলে তোমার টেলেক্স!' নিচু স্বরে হেসে উঠল লোকটা।

'পুরানো বন্ধু,' এবার কথা বলে উঠল অ্যালেক্স। আড়চোখে দেখল দরজাটা খুলে যাচ্ছে, করিডোরের আলোয় চকচক করছে সোনালী চশমার ফ্রেম। মেয়েটাকে ঠেলতে ঠেলতে দ্রুতগতিতে দেয়ালের কাছে চলে এল অ্যালেক্স। অস্ফুটে বিরক্তি প্রকাশ করল বসে থাকা দর্শকরা, তাড়াতাড়িতে কয়েকজনের পা মাড়িয়ে দিয়েছে ওরা।

নতুন স্লাইড দেখানো হচ্ছে, আলো পড়ল স্ক্রিনে। দেয়ালে হেলান দিয়ে মিশে যাবার চেষ্টা করল অ্যালেক্স, এখনও চেপে ধরে আছে মেয়েটাকে। অন্ধকারে ওদেরকে হঠাৎ করে দেখা যাবে না ঠিকই, কিন্তু নড়াচড়া করলে চোখে পড়তে বাধ্য।

'আমি চিৎকার করব!' ফিসফিস করে বলে উঠল মেয়েটা।

'আমিও গুলি করব, ঠিক তোমার হার্টে,' একইভাবে বলল অ্যালেক্স। খুনী দু'জন দু'ভাগে দু'দিকের আসনে বসা দর্শকদের পরীক্ষা করে দেখছে, খুঁজছে অ্যালেক্সকে।

ঠিক তখনই স্ক্রিনের আলো নিভে গেল, স্লাইড বদলানো হচ্ছে। এখনই সময়! সারা ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মিশেলের ঘাড়ে চাপ দিয়ে মাথা নিচু করে ধরে সরু আইল ধরে দৌড় লাগাল, স্লাইড চালু হবার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে। স্ক্রিনের পেছনের দেয়ালে লাল বাতিটা ওর চোখ এড়ায়নি। এতদূর থেকে পড়তে না পারলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না ওটাই হোটেলের কর্মচারীদের ব্যবহারের দরজা।

স্টেজের নিচে পৌঁছে মেয়েটাকে ওপরের দিকে ঠেলে দিল

অ্যালেক্স, 'স্টেজে উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও! ওই যে দরজাটা, লাল আলো জ্বলছে ওপরে!'

'ছেড়ে দাও বলছি! কিছুতেই যাব না!' ধস্তাধস্তি করছে মেয়েটা।

'ভাল চাও তো কথামত কাজ করো!' নির্দয়ভাবে মেয়েটার চুল ধরে ঝাঁকুনি দিল অ্যালেক্স। একলাফে স্টেজে উঠে হ্যাঁচকা টানে মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে দিল, 'দরজার দিকে দৌড়াও!'

ঠিক তক্ষুণি আলো পড়ল স্ক্রিনে। স্ক্রিনের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ধস্তাধস্তি করতে থাকা মূর্তি দুটো দেখে গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। পর মুহূর্তেই বিনামেঘে বজ্রপাতের মত গুলির শব্দ হল পরপর চারবার। ফুটো হয়ে গেল সাদা ক্যানভাসের স্ক্রিনটা। মিশেলকে জড়িয়ে ধরে মেঝেতে গড়িয়ে গেল অ্যালেক্স। মাঝখানের লাইন ধরে ছুটে আসছে আক্রমণকারীরা। সামনের সারির দর্শকরা চিৎকার শুরু করেছে, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সারা ঘরে।

মিশেলকে আঁকড়ে উবু হয়ে দৌড়াল অ্যালেক্স দরজার দিকে, আরও দুটো গুলি এসে বিঁধল আশেপাশে। দু'সেকেন্ডের মধ্যেই ভারি স্টিলের দরজা পেরিয়ে অন্যদিকে পৌঁছে গেল। জায়গাটা ওয়্যারহাউসের মত, কংক্রিটের মেঝে। চারদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো। সার্ভিস ট্রাক এখানে এসেই দাঁড়ায় মাল খালাস করার জন্যে। দরজাটা আটকে দিতে হবে! এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা ট্রলি আবিষ্কার করল অ্যালেক্স। মালপত্র ভেতরে নেবার কাজে ব্যবহার হয়। একহাতে টেনে ট্রলিটা দরজার সামনে নিয়ে এল, দরজার পাল্লার নিচে ঢুকিয়ে দিল দু'টুকরো কাঠ। এখন দরজাটা খুলতে বেশ কিছুক্ষণ কষ্ট করতে হবে। মিশেলের হাত ধরে খোলা শাটারের নিচ দিয়ে উঁকি দিল অ্যালেক্স। হোটেলের পেছন দিকে চলে এসেছে ওরা। পালাতে হলে সামনের

দিকে যেতে হবে। সন্দেহ নেই সামনে পেছনে সবদিকে পাহারা আছে। কিন্তু ওরা খুঁজবে একা একজন লোককে, কোন দম্পতিকে নয়। সেজন্যেই মেয়েটাকে ধরে এনেছে ও।

মিশেল এখনও হাত ছাড়াবার জন্যে ঝাপটাঝাপটি করে যাচ্ছে আর মুখে শাসাচ্ছে।

'শোনো,' জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল অ্যালেক্স, 'তুমি ছাড়া পেতে চাও?'

'চাই!' ফুঁপিয়ে উঠল মিশেল।

'তাহলে যা বলছি মন দিয়ে শোনো। সাধারণ দু'জন লোকের মত হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় উঠব আমরা। বাইরে পার্কিংলট। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে গল্প করতে করতে পার্কিংলটের শেষ প্রান্তে চলে যাব। একদম ছটফট করবে না, ঠিক আছে?' পেছনে ইস্পাতের দরজায় ঘা পড়ছে, চলে এসেছে ওরা!

মিশেলকে ডান হাতে আলতো করে ধরে শাটারের নিচ দিয়ে বেরিয়ে এল অ্যালেক্স। ধীরে ধীরে হাঁটছে পার্কিংলটের মাঝখান দিয়ে। মেয়েটার শরীরের মাংসপেশী শক্ত হয়ে আছে, তবে এখন আর বাধা দিচ্ছে না।

'উঃ! আমার কব্জি ভেঙে গেছে,' ককিয়ে উঠল মিশেল।

'না, কোন নার্ভের প্রান্তে চাপ লেগেছে, তাই ব্যথা করছে। ঠিক হয়ে যাবে,' চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে জবাব দিল অ্যালেক্স। পার্কিংলটে সারি সারি গাড়ি, কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না।

'তুমি একটা জানোয়ার!'

'আমি শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। আর কথা নয়, চুপ।'

খচ্ করে একটা শব্দ হল। ধাতব শব্দ। ডানদিকের সারির কোন

একটা গাড়ি থেকে এসেছে শব্দটা। কোন সারি? কোন গাড়িটা থেকে? যেন কিছুই সন্দেহ করেনি এভাবে কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল অ্যালেক্স। নাহ্! কাঁচের জানালাগুলোর পেছনে কোন সন্দেহজনক নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। কেউ কোথাও নেই।

না, কিছু একটা আছে। মন বলছে কিছু একটা দেখতে ভুলে গেছে ও। কি? খুব ছোট্ট একটা ব্যাপার। চমকে আবার পেছনে তাকাল।

ছোট্ট সবুজ একটা বৃত্ত। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে—ওদের চলার গতির সঙ্গে তাল রেখে অনুসরণ করছে। কি ওটা?

বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ে গেল। ক্রসহেয়ার! ইনফ্রারেড স্কোপ! নিশ্চয়ই রাইফেলের সঙ্গে ফিট করা আছে। কেউ নিশানা করছে! কেমন করে চিনল ওকে ওরা! নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ রেখেছে! গেমেইনশ্যাফ্‌ট ব্যাঙ্কে একজনের হাতে রেডিও ছিল! তাছাড়া মিশেলের পরনে পাতলা সিল্কের পোশাক, এই শীতে গরম কাপড় ছাড়া কোন মেয়ে বাইরে বেরুবে না। তার মানে ওরা সবাই এখন জানে ওর সঙ্গে একটা মেয়ে আছে।

নিমেষে এক ধাক্কায় মিশেলকে ডান দিকে ফেলে দিয়ে ওর শরীরটা আড়াল করে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল অ্যালেক্স।—ঠিক পরমুহূর্তেই ওদের দুফুট দূরে অ্যাসফল্টের চল্টা উড়িয়ে গর্জন করে উঠল একটা রাইফেল। সময় নষ্ট না করে গড়িয়ে একটা গাড়ির নিচে ঢুকে গেল অ্যালেক্স, হাতের নিচে প্রাণঘাতি চিৎকার জুড়েছে মিশেল। বুকে হেঁটে গাড়িটার পিছনের চাকার পাশে চলে এল অ্যালেক্স।

ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েই সবুজ-বৃত্তটা লক্ষ্য করে পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়ল। আর্তচিৎকার করে উঠল কেউ। ধীরে ধীরে গোঙানিতে পরিণত হল চিৎকারটা, তারপর এক সময় থেমে গেল। গুলি ছুঁড়েই

মাটিতে শুয়ে পড়েছিল অ্যালেক্স। উঠে বসার চেষ্টা করতে যেতেই ব্যথায় কুঁকড়ে গেল। মনে হচ্ছে কেউ যেন পেরেক গাঁথছে সারা শরীরে! দু'হাতে ভর দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যথাটা দূর করে দেবার চেষ্টা করল অ্যালেক্স। কোন কাজ হল না। হাঁটু, উরু আর বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় খানখান হয়ে যাচ্ছে। কেন হঠাৎ করে এমন হল? গুলি খায়নি—সেটা নিশ্চিত। মাত্র পাঁচ মাস আগে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে ও, শরীর এখনও পুরোপুরি সারেনি। সাধ্যের অতিরিক্ত খাটিয়েছে সে শরীরটাকে। উঃ! ঈশ্বর! যে করেই হোক উঠে দাঁড়াতে হবে ওকে, গাড়িটার কাছে পৌঁছাতে হবে!

গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে মেয়েটা, উঠে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষুণি দৌড়াতে শুরু করবে। না, কিছুতেই মেয়েটাকে পালাতে দেয়া যাবে না। যে করেই হোক ওকে থামাতে হবে।

দাঁতে দাঁত চেপে গড়িয়ে গেল অ্যালেক্স, মিশেলের পায়ের ঠিক চার ফুট দূরে থেমেছে। মেয়েটার মাথার দিকে রিভলভার তাক করে বলল, 'আমাকে টেনে তোলো!'

'কি?' সুন্দর দু'চোখে অবিশ্বাস।

'বলছি আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করো!' ধমকে উঠল অ্যালেক্স।

'তুমি বলেছিলে হোটেল থেকে বেরিয়ে আমাকে ছেড়ে দেবে!'

'কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি।'

'না!'

'যা বলছি করো, টেনে তোলো আমাকে। নয় তো মাথার খুলি ফুটো করে দেব!'

সাহায্য করতে বাধ্য হল মেয়েটা। নিজেই গাড়িটার কাছে হেঁটে

এল অ্যালেক্স, কোমরে খচ্ খচ্ করে লাগছে। মৃত লোকটাকে সীট থেকে রাস্তায় নামিয়ে ফেলল। তারপর পেছনের দরজা খুলে উঠে বসল ভেতরে। রিভলভারের নল দিয়ে ড্রাইভিং সীটের দিকে ইঙ্গিত করে মেয়েটাকে বলল, 'উঠে বসো। যেদিকে বলব ঠিক সেদিকে চালাবে।'

ছয়

'গাড়ি চালাব! আমি? এ শহরের কিছুই তো আমি চিনি না!' ঝাঁকিয়ে উঠল মিশেল।

'আমিও কিছু চিনি না। কোন অসুবিধা নেই, যেদিকে দু'চোখ যায় চালাও।' দাঁতে দাঁত চেপে কোমরের ব্যথাটা সহ্য করার চেষ্টা করছে অ্যালেক্স।

হোটেলের গেট দিয়ে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এল ওরা, লেকশোর ড্রাইভ ধরে গাড়ি চালাচ্ছে মিশেল। 'আমার বন্ধুরা আমাকে খুঁজছে,' নিজের মনেই বলে উঠল সে।

'আমাকেও অনেকে খুঁজছে।'

'আমার মতের বিরুদ্ধে আমাকে আটকে রেখেছ তুমি, আঘাত করেছ বেশ ক'বার,' মিশেলের কণ্ঠে আগের সেই ব্যক্তিত্ব ফিরে এসেছে, 'কিডন্যাপিং, শারীরিক অত্যাচার···এ সবই গুরুতর অপরাধ। তুমি বলেছিলে হোটেল থেকে বেরিয়েই আমাকে ছেড়ে দেবে। দয়া

করে যেতে দাও আমাকে, বিশ্বাস করো কাউকে কিছু বলব না আমি—কথা দিচ্ছি।'

'কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কথা দিয়েও কথা ফিরিয়ে নিয়েছি আমি। তুমিও তা করতে পারো।'

'তোমার কথা ভিন্ন, আমি তোমার মত নই। কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে না। দয়া করে যেতে দাও আমাকে!'

'কোন কথা নয়, মন দিয়ে গাড়ি চালাও।'

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে অ্যালেক্সের মাথায়। ছুটাছুটির সময় হাত থেকে স্যুটকেস ফেলে দিতে দেখেছে ওরা। তার মানে বুঝে নিতে ওদের অসুবিধা হবে না অ্যালেক্স জুরিখ থেকে পালাতে চাচ্ছিল। এখন থেকে এয়ারপোর্ট আর ট্রেন স্টেশনে ওরা পাহারা বসাবে। তাছাড়া ওদের একজন খুন হয়েছে, তার গাড়িটাও লাপাত্তা—সন্দেহ নেই গাড়িটা খুঁজছে ওরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি বদলাতে হবে।

তবে ও একেবারে অসহায় নয়। পাসপোর্টের ভাঁজে ১০০,০০০ সুইস এবং ১৬,০০০ ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ রয়েছে ওর কাছে। লুকিয়ে প্যারিসে।

প্যারিস! কেন প্যারিস? প্যারিসের কথাই কেন বারবার মনে পড়ছে? যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল ওকে প্যারিস যেত হবে। চুম্বকের মত টানছে ওকে শহরটা।

'তুমি কি আগে কখনও জুরিখে এসেছিলে,' প্রশ্ন করল অ্যালেক্স।

'কস্মিনকালেও না।'

'মিথ্যে বলছ না তো?'

'আশ্চর্য! কেন মিথ্যে বলব? দয়া করে ছেড়ে দাও আমাকে!'

'কবে এসেছ জুরিখে?'

'এক সপ্তাহ আগে। আজই কনফারেন্স শেষ হয়ে যাবার কথা।'

'তার মানে ঘুরে বেড়াবার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছ।'

'বলতে গেলে হোটেলের বাইরে কোথাও যাইনি, সময় ছিল না।'

'লবিতে স্কেজ্যুল রাখা ছিল, তাতে তো দেখলাম দিনে দুটোর বেশি সেশন নেই—তাহলে এত ব্যস্ততা কিসের?'

'সেশনগুলো অতিথি-বক্তাদের জন্যে রাখা হয়েছে। আমাদের আসল কাজ কনফারেন্স...মানে ছোট ছোট মীটিং করা। কয়েকটা দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের দশ-বারোজন করে বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়েছে এই কনফারেন্সে।'

'তুমি ক্যানাডা থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ। আমি কেনেডিয়ান সরকারের ট্রেজারি বোর্ডের ন্যাশনাল রেভিন্যু বিভাগে চাকরি করি।'

'অর্থনীতিবিদ?'

'মন্ট্রিয়লের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছি।'

'তুমি দেখছি বিদূষী মহিলা!'

'আজ রাতে আমার অটোয়ায় ফোন করার কথা। ফোন না পেলে আমার বস্ জুরিখে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। তারপর পুলিশে জানাবে।'

'তাই নাকি?' মিশেলের সম্বন্ধে ওর শ্রদ্ধা বেড়েই চলেছে, এত বিপদের মধ্যেও মেয়েটা একটুও ঘাবড়ায়নি। 'তোমার পার্সটা দাও তো।'

'কি?' চকিতে হুইল থেকে ডান হাত সরিয়ে নিয়ে পাশের সীটের ওপর রাখা পার্সটা আঁকড়ে ধরল মেয়েটা।

পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে সেটা ছিনিয়ে নিল অ্যালেক্স। 'চুপচাপ গাড়ি চালাও।'

'কি অধিকার আছে তোমার...' বলতে বলতে থেমে গেল মিশেল পরিস্থিতির অসারতার কথা চিন্তা করে।

খুট করে ছাদের আলোটা জ্বালিয়ে চামড়ার তৈরি কালো পার্সটা খুলে ফেলল অ্যালেক্স। পাসপোর্ট, টাকা-পয়সা আর ক্রেডিট কার্ড রাখার ওয়ালেট, এক গোছা চাবি, লিপস্টিক আর কম্প্যাক্ট। সামনের খোপে ছোট ছোট চিরকুট। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল সে। হোটেলের ডেস্কে রিসেপশনিস্ট হলুদ খাম থেকে বের করে এই কাগজটাই মিশেলের হাতে দিয়েছিল, অটোয়া থেকে আসা টেলেক্স। ভাঁজ খুলে মেসেজটা পড়ল। বব নামের কেউ জানিয়েছে মিশেলের ছুটি বাড়ানো হয়েছে, ছাব্বিশ তারিখ বুধবার সে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবে। এছাড়া কিছু রিপোর্ট পাঠাবার কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে।

কাগজটা ভাঁজ তরে পার্সে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে কি যেন ঠেকল আঙুলের ডগায়। ছোট্ট একটা ম্যাচের প্যাকেট। ওপরে কি যেন লেখা আছে। দু'আঙুলে ধরে বের করে নিয়ে এসে আলোর নিচে পড়ল নামটা, 'ক্রোনেনহাল'। একটা রেস্টোরান্ট। কেন যেন অস্বস্তি বোধ করল অ্যালেক্স। রেস্টোরান্টটা কি ওর চেনা? ম্যাচটা হাতে রেখে পার্সটা সামনের সীটে ছুঁড়ে দিল অ্যালেক্স। একদৃষ্টে ম্যাচের ওপর লেখা নামটার দিকে চেয়ে আছে ও, 'ছাব্বিশ তারিখ এখনও অনেক দূরে।'

'প্লীজ...' অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠল মিশেল।

করুণায় ভরে গেল অ্যালেক্সের হৃদয়। কিন্তু, না! এখনও ওকে যেতে দেয়া যায় না। গাড়ি চালাবার জন্যে ওকে দরকার, অন্তত যতক্ষণ না অ্যালেক্স নিজে গাড়ি চালাবার মত শক্তি অর্জন করছে।

তবে সবচেয়ে আগে গাড়ি বদলাতে হবে।

'গাড়ি ঘোরাও,' আদেশ করল অ্যালেক্স। 'ক্যারিলনে ফিরে চলো।'

'কি?...হোটেলে?'

'হ্যাঁ,' অ্যালেক্স এখনও একদৃষ্টে ম্যাচটা দেখছে। 'আর একটা গাড়ি দরকার আমাদের।'

'আমাদের! না, আমি আর কোথাও যাচ্ছি না...' বলতে বলতে আবার থেমে গেল মিশেল। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে হোটেলের দিকে ফিরে চলল। বিপদজনকভাবে বেড়ে গেছে গাড়ির গতি।

ম্যাচ থেকে চোখ সরিয়ে মিশেলের লালচে-বাদামী চুলে ঢাকা মাথার পেছনটা দেখল অ্যালেক্স। তারপর হাতের রিভলভারের নলটা দিয়ে খোঁচা দিল মেয়েটার মাথায়। 'আমি যা বলছি ঠিক তাই করবে তুমি। কোনরকম চালাকি নয়, ঠিক আমার পাশে পাশে হাঁটবে। রিভলভারটা আমার পকেটে থাকবে তবে তোমার তলপেটের দিকে নিশানা করা অবস্থায়। তুমি তো জানোই জীবন বাঁচানর জন্যে ছুটছি আমি, ট্রিগার টানতে একটুও ইতস্তত করব না। বুঝতে পারছ?'

'বুঝতে পারছি,' ফিসফিস করে বলল মিশেল, ভয় পেয়েছে নতুন করে।

অস্বস্তিটা কাটছে না। ম্যাচের প্যাকেটটা ওকে কিসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে? অ্যালেক্স নিশ্চিত 'ক্রোনেনহাল' নামের কোন রেস্টোরান্ট ও চেনে না। তাহলে কি অন্য কোন রেস্টোরান্ট? কোন রেস্টোরান্ট? শুধু মনে পড়ছে বিশাল কংক্রিটের কয়েকটা থাম ছড়িয়ে আছে ফ্লোরে, মোমবাতির রোমান্টিক আলো, কালো...হ্যাঁ, রেস্টোরান্টের বাইরে ঢোকার দরজার ঠিক ওপরে বড় বড় তিনটে কালো ত্রিভূজ। সাদা পাথরের ওপর তিনটে কালো ত্রিভূজ।

কে যেন আছে ওখানে। কে সে? এরকম কোন জায়গা কি আদৌ আছে?

দূরে ক্যানিয়ন দ্যু লাকের ঝলমলে আলোকসজ্জা দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত এতক্ষণে ওরা পাত্তাড়ি গুটিয়েছে। যদি এখনও ওরা হোটেলের আশেপাশে থেকে থাকে, তবে সোজা গিয়ে ওদের ফাঁদের মধ্যে পড়তে হবে। অ্যালেক্স ওদের মধ্যে মাত্র দু'জনকে চেনে, অন্য কাউকে সামনে দেখলেও চিনবে না।

পার্কিঙে যাবার রাস্তা হোটেলের বাঁ দিকে। 'আস্তে চালাও,' আদেশ করল অ্যালেক্স, 'বাঁ দিকের প্রথম রাস্তাটা ধরো।'

ওটা তো বের হবার রাস্তা, ঢোকার রাস্তা এর পরেরটা।'

'যা বলছি তা করো! কেউ তো বের হচ্ছে না এখন!' ধমকে উঠল অ্যালেক্স। 'সোজা পার্কিংলটে ঢুকে যাও।'

কেউ ওদেরকে লক্ষ করল না, কারণ হোটেলের সামনে দাঁড়ানো চারটে পুলিশের গাড়ি। ইউনিফর্ম পরা পুলিশ আর হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে ছুটাছুটি করছে হোটেলের অতিথিরাও।

গাড়িটা অন্ধকার পার্কিংলটের শেষ অংশে পার্ক করল মিশেল।

'খুব সাবধান,' কাঁচের জানালা নামাতে নামাতে বলল অ্যালেক্স। 'খুব ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামো, তারপর দরজা খুলে আমাকে নামতে সাহায্য করো। মনে রেখো জানালাটা খোলা আর আমার হাতে রিভলভার। মাত্র দু'তিন ফুট দূর থেকে গুলি ফস্কাবার কোন কারণ নেই।'

অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করল মিশেল। জানালার ফ্রেমে ভর দিয়ে নিচে নেমে দাঁড়াল অ্যালেক্স। আস্তে আস্তে ডান পা থেকে শরীরের ভার বাঁ পায়ে নিল। হাঁটতে পারছে, তবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

'এখন কি করবে?' জানতে চাইল মিশেল।

'অপেক্ষা করব। এক সময় কেউ না কেউ গাড়ি পার্ক করতে আসবেই। ডিনারের সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি, যত গণ্ডগোলই হোক, রিজার্ভেশন তো আর ওরা ক্যানসেল করবে না।'

'কোন গাড়ি এলে তুমি কি করবে? কেমন করে দখল করবে গাড়ি?' তারপর চোখ বড় বড় করে শিউরে উঠল সে নিজেই, 'হায় ঈশ্বর! গাড়ির ড্রাইভারকে খুন করবে তুমি!'

ঝট করে মেয়েটার বাহু আঁকড়ে ধরল অ্যালেক্স, 'দরকার হলে খুন করব। তবে মনে হয় না তা করতে হবে। সাধারণত পার্কিং অ্যাটেনডেন্ট গাড়ি পার্ক করতে আসে, চাবিটা রেখে যায় ড্যাশবোর্ডে বা সীটের নিচে। এরকম হলে কোন ঝামেলা হবে না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা সিট্রোঁয়া এগিয়ে এল দ্রুতগতিতে, সোজা ওদের দিকে। হেডলাইটের আলো সরাসরি ওদের গায়ে পড়েছে, লুকিয়ে পড়ার সময় হল না। পাশেই খালি একটা স্পেসে ঢুকল গাড়িটা। গাড়ির মালিক নয়, পার্কিং অ্যাটেনড্যান্ট বেরিয়ে এল চাবিটা সীটের নিচে ছুঁড়ে দিয়ে। ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল লোকটা। চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল অ্যালেক্সের মাথায়।

'এই যে, ইয়াঙ ফেলো! তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পারো,' জড়ানো কণ্ঠে ওকে ডাকল অ্যালেক্স।

'মাফ করবেন, স্যার?' ঘুরে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ চোখে ওর আপাদমস্তক দেখল সে, হোটেলের গণ্ডগোলের কথা মনে করে সাবধান হতে চাইছে।

'আমি একটু অসুস্থ, তোমাদের হোটেলের সুইস ওয়াইনের কোন

তুলনা নেই,' আলতো একটা ঢেকুর তুলল অ্যালেক্স।

'বেশি খেলে ওরকম একটু আধটু শরীর খারাপ লাগবেই, স্যার। চিন্তা করবেন না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবেন,' আশ্বস্ত হয়ে হাসল অ্যাটেনড্যান্ট।

'আমার স্ত্রী বলল শহর ছাড়ার আগে তাজা বাতাসে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে নিতে।'

'উনি ঠিকই বলেছেন, স্যার,' মিশেলের দিকে চেয়ে হাসল লোকটা।

'ভেতরের অবস্থা কিরকম? বাব্বা! পুলিশ তো হোটেল ছেড়ে আমাদেরকে বের হতেই দেবে না! অবশেষে ব্যাটার ইউনিফর্মে যখন বমি করার উপক্রম করলাম, নিজেই ঠেলে বের করে দিল।'

'আর বলবেন না, স্যার! পুলিশে ছেয়ে গেছে ভেতরটা...ওহ্-হো! আমাদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে।'

'অবশ্যই অবশ্যই। তবে এদিকে আমি একটু ঝামেলায় পড়ে গেছি। আমার এক বিজনেস পার্টনারের সঙ্গে দেখা করার কথা একটা রেস্টোরান্টে। অথচ রেস্টোরান্টের নামটাই মনে করতে পারছি না! আমি ওখানে গেছি...অথচ কিছুতেই নামটা মনে আসছে না। রেস্টোরান্টের বাইরে একটা ডিজাইন আছে...তিনটে ত্রিভূজ...সাদার ওপর কালো দিয়ে করা...'

'ওটা তো, স্যার, "গোল্ডেন ব্রিজ"। ফলকেনস্ট্রাসের পরের রাস্তায়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! গোল্ডেন ব্রিজই বটে! তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে আমাকে যেতে হবে...' পাঁড় মাতালের মত মাথায় টোকা দিয়ে দিয়ে

মনে করার অভিনয় করছে অ্যালেক্স।

'বের হয়ে বাম দিকে মোড় নেবেন, স্যার। উল্টো কোয়াই হয়ে একশো মিটার পরে এলগিনে ডানে মোড় নেবেন। এরপরে ফলকেনস্ট্রাসে পড়বেন, ওটা ওয়ান-ওয়ে রাস্তা। সিফেল্ড পার হলেই রাস্তার কোনায় রেস্টোরান্টের সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন।'

'ধন্যবাদ, ইয়াঙ ম্যান। ঘণ্টা দুই পর কি তুমি এখানেই থাকবে?'

'রাত দুটো পর্যন্ত আমি আছি, স্যার।'

'গুড। তাহলে ফিরে এসে তোমাকে খুঁজব আমি। আর্থিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার, যা উপকার করলে তুমি!'

'ধন্যবাদ, স্যার,' দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে মুখের হাসি, 'আপনার গাড়িটা নিয়ে আসব, স্যার?'

'না না! এমনিতেই অনেক করেছ। তাছাড়া একটু হাঁটলে মাথা ঘোরাটা হয়ত কমবে।' স্যালুট করে হোটেলে ফিরে গেল অ্যাটেনড্যান্ট। অ্যালেক্স মিশেলকে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে এল সিত্রোঁয়ার পাশে। 'জলদি! চাবিটা সীটের নিচে।'

'ওরা যদি থামতে বলে, তখন কি করব? অ্যাটেনড্যান্ট গাড়িটা বের হতে দেখলে ঠিকই চিনে ফেলবে, এই মাত্র রেখে গেল!'

'মনে হয় না। যদি এক্ষুণি আমরা বেরিয়ে যাই, ব্যাটা খেয়াল করবে না। এখনও ফিরতি পথে হাঁটছে সে। তাছাড়া ওদিকে গ্যাঞ্জাম হচ্ছে, ওর মনোযোগ থাকবে সেদিকে।'

'কিন্তু, ধরো যদি দেখে ফেলল?'

'তাহলে দেখব তুমি কত জোরে গাড়ি চালাতে পারো।' দরজার দিকে ঠেলে দিল ওকে অ্যালেক্স, 'উঠে পড়ো।' রিভলভারটা মিশেলের দিকে তাক করে গাড়ির হুড ধরে ধরে ঘুরে প্যাসেঞ্জার সীটের পাশে চলে

এল। দরজা খুলে মিশেলের পাশে এসে বসল, 'কি হল?'

'চাবিটা পাচ্ছি না তো!' ঝুঁকে সীটের নিচে হাতড়াচ্ছে মেয়েটা।

'ভাল করে দেখো।'

অবশেষে পেল। চামড়ার কভারে মোড়া এক সেট চাবি।

'ইঞ্জিন চালু করো। তবে আমি না বলা পর্যন্ত সামনে এগুবে না।' চারদিকে নজর বুলিয়ে নিশ্চিত হল অ্যালেক্স, কেউ নেই। 'আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাও, স্পিড যেন না ওঠে।'

হোটেলের সামনে এখনও গোলমাল চলছে। পুলিশের সঙ্গে তর্ক করছে একদল লোক, সম্ভবত হোটেলের গেস্ট। কেউ ওদেরকে লক্ষ করল না।

সাদা অমসৃণ পাথুরে পটভূমিকায় কালো কাঠের তৈরি তিনটে ত্রিভূজ। নিচে লেখা 'গোল্ডেন ব্রিজ'। কোন সন্দেহ নেই এখানে আগেও এসেছিল অ্যালেক্স। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে মনের পর্দায় ভেসে ওঠা ত্রিভুজের ডিজাইনটা। অথচ, আশ্চর্য! কোন স্মৃতি নেই! কেমন যেন ভৌতিক মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা।

রেস্টোরান্টের আশেপাশের বাড়িগুলো বহু পুরানো, পাথরের তৈরি, কারুকার্যখচিত দরজা-জানালা। সামনের রাস্তাটাও সরু, ইঁট বিছানো। মোটরগাড়ি নয়, এ রাস্তায় ঘোড়ার গাড়িই বেশি মানাত।

'আমরা পৌঁছে গেছি,' মিশেল নীরবতা ভাঙল।

'জানি।'

'কি করব এখন? জায়গাটা তো পার হয়ে গেল!'

'সামনের রাস্তায় বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আবার এখানে ঘুরে এসো।'

'কেন?' অবাক হল মিশেল।

'যদি জানতাম!' নিঃশ্বাস ফেলল অ্যালেক্স।

'কি?'

'যা বলছি তা করো, কোন প্রশ্ন নয়।' মেলট্রেনের গতিতে চিন্তা চলছে মাথার ভেতর। শুধু মনে হচ্ছে কে যেন আছে ওখানে। কে? কেন মনে পড়ছে না?

আরও দু'বার গোল্ডেন ব্রিজের সামনে চক্কর দিল ওরা। জনা চারেক পুরুষ-মহিলাকে ভেতরে ঢুকতে দেখল, একজন যুবকই শুধু বের হয়ে ফলকেনস্ট্রাসের দিকে চলে গেল। রেস্টোরান্টের সামনে পার্ক করা গাড়ির সংখ্যা দেখে বোঝা যায় ভেতরে ভিড় নেহাত কম নয়। জুরিখের বাসিন্দারা ইওরোপের অন্যান্য এলাকার লোকদের মত সন্ধ্যে লাগতেই রাতের খাবার খেয়ে নেয় না। এখন রাত আটটা, তারমানে ডিনারের ভিড় এখনও শুরু হয়নি। এভাবে বোকার মত ঘুরে বেড়াবার কোন মানে হয় না, কিছু একটা ঘটবে এমন আশা করা বৃথা। অ্যালেক্স নিজেই জানে না ও কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে। নাহ্, সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

'সবশেষের গাড়িটার পেছনে পার্ক করো,' আদেশ করল অ্যালেক্স।

কোন রকম প্রশ্ন না করে আদেশ পালন করতে থাকল মিশেল। ব্যাপারটা কি? বড় বেশি শান্ত মনে হচ্ছে মেয়েটাকে। কোন মতলব আঁটছে না তো? সেরকম হলে ভালমত একটা শিক্ষা দিতে হবে। রেস্টোরান্টের ভেতরটা দেখে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না অ্যালেক্স। কিন্তু এরপরই জুরিখ থেকে কেটে পড়তে হবে ওকে, মেয়েটার সাহায্য ছাড়া সেটা করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

গাড়িটা পার্ক করে ইঞ্জিন বন্ধ করল মিশেল। ধীরে ধীরে ইগনিশন থেকে খুলে নিচ্ছে চাবিটা। ধীরে—বড় বেশি ধীর গতিতে নড়াচড়া

করছে সে। অ্যালেক্স হাত বাড়িয়ে চাবিসহ মিশেলের কব্জি চেপে ধরল।

'ওটা আমার কাছে থাকবে।'

'অবশ্যই,' চাবি ছেড়ে দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে উত্তর দিল মিশেল।

'সাবধানে থেমে দাঁড়াও, কোন চালাকি নয়!'

'শুধু শুধু খুন হবার কোন খায়েশ আমার নেই,' মিশেলের কণ্ঠে চাপা শ্লেষ।

'এই তো বুদ্ধি খুলেছে।' দরজা খোলার জন্যে পাশ ফিরল অ্যালেক্স।

খসখসে শব্দ উঠল পোশাকের ঘর্ষণের, পরমুহূর্তেই দরজা খুলে বাইরে লাফ দিল মেয়েটা। কিন্তু অ্যালেক্স তৈরি ছিল, এরকম কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ঘুরেই চিতাবাঘের মত লাফ দিল, ডান হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছে মেয়েটার ঘাড়ের কাছে পোশাকের অংশবিশেষ। রাস্তায় নেমে পড়েছিল প্রায়, আবার টেনে ভেতরে নিয়ে এল। চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে মুখোমুখি হল।

'আর করব না!' বাঁশপাতার মত কাঁপছে মেয়েটা, জলে ভরে উঠেছে দু'চোখ, 'আর কক্ষণও করব না!'

ডান হাতে চুলের মুঠি ধরে রেখেই বাঁ হাতে মেয়েটার দিকের দরজা বন্ধ করে দিল অ্যালেক্স। দরকার হলে খুন করতে হবে মেয়েটাকে। কিন্তু সময় এলে সত্যিই কি তা করতে পারবে ও?

'একটা কিছু বলো!' ফুঁপিয়ে উঠল মিশেল। ত্বকের সঙ্গে সেঁটে থাকা সমুদ্র-নীল সিল্কের পোশাকের নিচে ফুলে ফুলে উঠছে পুষ্ট এক জোড়া বুক, দু'হাত মুঠো পাকিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কাঁপুনি

থামাবার। 'বলছি তো আর কক্ষণও করব না! প্রতিজ্ঞা করছি!'

'তুমি আবার চেষ্টা করবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল অ্যালেক্স। 'সুযোগ পেলেই আবার একই কাণ্ড করবে, আমি জানি। বিশ্বাস করো, তাহলে তোমাকে খুন করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না। যদিও আমি তা করতে চাই না। কিন্তু আমার জীবনের ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ালে এছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না,' বলতে বলতে নিজেই অবাক হয়ে গেল অ্যালেক্স। এত সহজে আর একজন মানুষকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে! আসলে ও কে?

'তুমি বলেছ আমাকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু কখন?' অশ্রু মুছতে মুছতে অভিযোগের ভঙ্গিতে জানতে চাইল মিশেল।

'যখন বিপদ কেটে যাবে। তুমি মুখ খুললেও যখন আমার কোন ক্ষতি হবে না।'

'কিন্তু কখন আসবে সে সময়টা?'

'আর ঘণ্টাখানেক পর। যখন জুরিখ থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'কেমন করে জানব তুমি সত্যি কথা বলছ কিনা?'

'জানার কোন দরকার নেই,' ওর চুল ছেড়ে দিল অ্যালেক্স, 'ভাল করে চোখ-মুখ মুছে চুল আঁচড়ে নাও। আমরা ভেতরে যাব।'

'কেন? কি আছে ওখানে?'

'যদি জানতাম!' একদৃষ্টে চেয়ে আছে অ্যালেক্স গোল্ডেন ব্রিজের আলোকিত জানালার দিকে।

'তার মানে? আগেও এরকম অদ্ভুত কথা শুনেছি তোমার মুখে।'

ঘুরে একজোড়া ঘন বাদামী চোখের মুখোমুখি হল অ্যালেক্স, আস্তে করে বলল, 'আমি জানি। এখন আর কোন কথা নয়, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

গোল্ডেন ব্রিজের ভেতরটা দেখলে ফেলে আসা শতাব্দীর কথা মনে করিয়ে দেয়। কারুকার্যখচিত বিশাল সব পাথুরে থাম উঁচু অ্যালপাইন সিলিঙে মিশেছে, থামের আড়ালে ছোট ছোট বুদ। মোমবাতি জ্বলছে প্রতিটা বুদে, চারপাশে আলো-আঁধারির খেলা। লোকজনের ভিড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুবেশী অ্যাকর্ডিয়ান-বাদক, মন-কেমন-করা বেভারিয়ান সঙ্গীত-মূর্ছনা ভেসে বেড়াচ্ছে ইথারে। সত্যিই চমৎকার।

সবচেয়ে বড় কথা, সবকিছুই অ্যালেক্সের বড় পরিচিত। এমনকি বেভারিয়ান সুরটা পর্যন্ত। এখানে আগেও এসেছে সে। ওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কালো টাক্সিডো পরা সুদর্শন হোস্ট এগিয়ে এল, 'স্যার, আপনাদের রিজার্ভেশন আছে তো?'

মাথা নাড়ল অ্যালেক্স, এক হাতে আলতো করে ধরে আছে মিশেলের কোমর, 'না, তা নেই। তবে আমি নিশ্চিত আপনি একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

হাসল লোকটা, 'অবশ্যই, স্যার। এখনও ভিড় শুরু হয়নি। আমাকে অনুসরণ করুন, আশা করি ভাল একটা টেবিলই দিতে পারব আপনাদের।'

সত্যিই চমৎকার বুদটা। টেবিলে দামি লাল-সাদা চেক-কাটা কভার, সুন্দর একটা পাত্রে মোমবাতি জ্বলছে। ইশারা করতে বসে পড়ল মিশেল, অ্যালেক্স বসল ওর উল্টোদিকে মুখোমুখি।

'দেয়ালের দিকে সরে যাও,' হোস্ট চলে যেতেই অ্যালেক্স আদেশ করল। 'জানো তো, রিভলভারটা আমার পকেটেই আছে।'

'বলেছি তো আর করব না।'

'না করলেই ভাল। খাবার সময় নেই, একটা ডিঙ্কের অর্ডার দাও।'

'এমনিতেও খাবার রুচি আমার নেই,' মিশেলের হাত দুটো টেবিলের ওপর এখনও একটু একটু কাঁপছে, 'কিন্তু সময় নেই কেন? কিসের জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি?'

'আমি জানি না।'

'বার বার কেন বলছ "আমি জানি না" "আমি জানি না"? কেন এখানে এসেছ তুমি?'

'কারণ আগেও এখানে এসেছি আমি।'

'মানে?'

'সবকিছুর মানে বলতে হবে নাকি তোমাকে?'

ওয়েটার এগিয়ে এল মেন্যু হাতে। মিশেল টম্যাটো জ্যুসের অর্ডার দিল, অ্যালেক্স চাইল স্কচ—কড়া একটা ড্রিঙ্কের প্রয়োজন অনুভব করছে সে। চারপাশে নজর বুলাতে লাগল, যদি কিছু মনে পড়ে যায়! কিন্তু না, কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

হঠাৎ করেই ঘরের অপরপ্রান্তে চোখ আটকে গেল। একজোড়া ভয়ার্ত চোখ ওকে লক্ষ করছে। বিশাল চেহারা লোকটার, যেমন বেঁটে তেমন মোটা। চকচকে কামানো মাথা। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা বুদে বসে আছে দেয়াল ঘেঁষে। লোকটাকে অ্যালেক্স চিনতে পারল না, কিন্তু সে ঠিকই চিনেছে। নার্ভাস ভঙ্গিতে হাতের তালুতে ঘামে ভেজা মুখ মুছল মটু, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রওনা হল ওদের দিকে।

'একটা লোক এদিকে আসছে,' বিড়বিড় করে বলল অ্যালেক্স। 'ভীষণ মোটা লোকটা, মনে হয় কোন কারণে ভয় পেয়েছে। যাই বলুক না কেন, তুমি একদম মুখ খুলবে না। সরাসরি ওর দিকে তাকাবে না। কনুই টেবিলে রেখে মুখটা ডান হাতে ঢেকে রাখো, মুখ তুলে তাকাবে না।'

প্রশ্ন করতে গিয়েও থেমে গেল মিশেল। অ্যালেক্সের কথামত বাঁ হাতে মুখ ঢাকল, চোখে চাপা কৌতূহল।

'তোমার ভালর জন্যেই চেহারা ঢাকতে বলছি,' ওর কৌতূহল মেটাবার ভঙ্গিতে বলল অ্যালেক্স, 'আমি চাই না লোকটা তোমার চেহারা চিনে রাখুক।'

মটু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল অ্যালেক্স। দূর থেকে কেউ এখন ওদের চেহারা দেখতে পাবে না।

'এখানে কেন এসেছ তুমি? তোমার কোন ক্ষতিটা আমি করেছি যে আমাকে এভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছ?' ভয় পাওয়া ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় কাতরে উঠল মটু, গলগল করে ঘামছে, বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

'তুমি তো জানো এখানকার খাবার আমার খুব পছন্দ,' শান্ত ভাবে বলল অ্যালেক্স।

'বিবেক বলে কি কিছুই তোমার নেই? তিন ছেলে-মেয়ের বাবা আমি! দয়া করো! তোমাকে এনভেলাপটা দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু বিশ্বাস করো, ভেতরে কি আছে তা দেখার চেষ্টা করিনি। বিশ্বাস করো কিচ্ছু জানি না আমি!'

'এনভেলাপটা দেবার জন্যে তো পারিশ্রমিক নিয়েছ তুমি, নাওনি?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল অ্যালেক্স, লোকটা কি বলছে সে সম্বন্ধে নূন্যতম ধারণাও ওর নেই।

'নিয়েছি! কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি আমি! তোমার সম্বন্ধে একটা কথাও আমার পেট থেকে বের হয়নি!' প্রায় কেঁদে ফেলল মটু।

'তাহলে এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো শুধু খেতে এসেছি এখানে।'

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে তুমি চলে যাও!'

'এখন কিন্তু রেগে যাচ্ছি আমি। সবকিছু খুলে বলবে কিনা বলো।'

বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছল লোকটা। ঝটিতে একবার দরজার দিকে তাকাল, তারপর উবু হয়ে কাঁপাকাঁপা ফিস্‌ফিসে গলায় বলল, 'হয়ত অন্য কেউ মুখ খুলেছে, যারা তোমাকে চেনে। পুলিশ এখন আমার পেছনে লাগবে!'

নিষেধ ভুলে অ্যালেক্সের দিকে মুখ তুলে চাইল মিশেল, 'পুলিশ...ওরা পুলিশ ছিল!'

ওর দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে আবার মটুর মুখোমুখি হল অ্যালেক্স, 'তোমার কি মনে হয় পুলিশ তোমার বউ বাচ্চাদের ক্ষতি করবে? সেজন্যেই তোমার এত ভয়?'

'পুলিশকে অত পাত্তা দেই না আমি। কিন্তু ওরা যদি একবার জানতে পারে পুলিশ আমাকে খুঁজছে, তাহলে এরপরে কি আমি বেঁচে থাকব?' অজান্তেই গলাটা উঁচুতে উঠে গিয়েছিল, বুঝতে পেরে আবার নিচুতে নামিয়ে আনল, 'তুমি তো ভাল করেই জানো ধরতে পারলে ওরা আমার কি অবস্থা করবে! জানে মারলে সেটা হবে আমার সৌভাগ্য। দয়া করো, আমার বউ-বাচ্চার মুখের দিকে চেয়ে আমাকে একটু দয়া করো। চলে যাও এখান থেকে। কাউকে কিছু বলিনি আমি।'

'বাড়িয়ে বলছ তুমি,' ওয়েটারের রেখে যাওয়া কাচের গ্লাস তুলে নিল অ্যালেক্স, যেন ওর কথার কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না।

'দোহাই লাগে ঈশ্বরের, আমার এত বড় ক্ষতি কোরো না!' মোটা শরীরটা টেবিলের ওপর এলিয়ে দিয়ে টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরল লোকটা দু'হাতে, গলার স্বর আরও নিচুতে নামিয়ে এনেছে, 'আমার মুখ বন্ধ ছিল কিনা জানতে চাইছ তো? ঠিক আছে, প্রমাণ দিচ্ছি।'

আর একবার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বলতে থাকল, 'গুজব নয়, সত্যি সত্যিই জুরিখ-পুলিশ একটা টেলিফোন নাম্বার বিলি করছে চারদিকে—যার ইচ্ছে যে কোন ধরনের তথ্য জানাতে পারে ওই নাম্বারে, পুলিশ কোন প্রশ্ন করবে না। বিনিময়ে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্টারপলের মাধ্যমে পুরস্কারের টাকা পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে। তুমি জানো আমি গরিব লোক, পুরস্কারের টাকাটা আমার কত কাজে লাগত! অথচ আমি পুলিশের কাছে যাইনি! কারও কাছে মুখও খুলিনি!'

'তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কারও কাজ। সত্যি করে বলো তো কাকে সন্দেহ হয় তোমার? ভেবেচিন্তে উত্তর দাও, জানো তো, ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করলে পার পাবে না।'

'আমি শুধু ব্যাকোফেনকে চিনি। আমার জানা মতে একমাত্র ও-ই তোমাকে দেখেছে, আর কেউ তোমার চেহারা চেনে না। কিন্তু ব্যাকোফেন ফাঁস করবে বলে মনে হয় না, শত হলেও এনভেলাপটা ওর মাধ্যমেই এসেছে আমার কাছে।'

'ব্যাকোফেন এখন কোথায়?'

'কোথায় আবার, লাওয়েনস্ট্রাসে ওর ডেরায়!'

'চিনি না। নাম্বার কত?'

'চেনো না!' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মটু, 'ব্যাপার কি? আমাকে পরীক্ষা করছ নাকি?'

'কথা না বাড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দাও। কত নাম্বার?'

'বত্রিশ, তুমি ভাল করেই জানো।'

'তাহলে ধরে নাও পরীক্ষাই করছি। ব্যাকোফেনকে এনভেলাপটা দিয়েছিল কে?'

পাথরের মত স্থির হয়ে গেল লোকটা, 'জানার কোন উপায় ছিল না। জানতে চাইও না।'

'একটু কৌতূহলও হয়নি?'

'অবশ্যই না।'

'এনভেলাপে কি ছিল?'

'আগেই তো বলেছি ওটা খুলিনি আমি।'

'তবুও আন্দাজ তো করতে পারো, পারো না?'

'টাকা...যতদূর মনে হয়।' বড় করে শ্বাস টানল লোকটা, 'টাকা যদি নাও থাকে, তাতে আমার কোন হাত নেই। এখন দয়া করে তুমি চলে যাও! চলে যাও!'

'শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর চাই,' একদৃষ্টে চেয়ে আছে অ্যালেক্স।

'তাড়াতাড়ি বলো, আর কি জানতে চাও? শুধু আমার কোন ক্ষতি কোরো না। যা জানি সবই তোমাকে বলেছি।'

'এনভেলাপের টাকাটা কিসের জন্যে দেয়া হয়েছিল?' অ্যালেক্সের চোখের পাতা একটুও কাঁপল না।

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে মটু, ঘৃণায় চকচক করে উঠল কুঁতকুঁতে দু'চোখ, 'তুমিই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছ! কিন্তু তারপরেও তোমার দিকে আমি পিঠ ফেরাব না, বিশ্বাস করো! প্রতিদিন আমি খবরের কাগজ পড়ি, একটা ভাষায় নয়, তিন-তিনটে ভাষায়। ছ'মাস আগে একজন লোক খুন হয়। সেই হত্যাকাণ্ডের খবর প্রতিটা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল।'

সাত

ফলকেনস্ট্রাসে ধরে বেরিয়ে গ্রসমুনস্টার ক্যাথেড্রালের রাস্তা ধরল ওরা। লাওয়েনস্ট্রাসে নদীর উল্টোদিকে। ব্যানহফস্ট্রাসে থেকে মুনস্টার ব্রিজ পার হয়ে যেতে হবে। রেস্টোরান্ট বের হবার পর ওরা দু'জনই চুপ মেরে গেছে।

কেউ একজন খুন হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ লোক—সন্দেহ নেই। কারণ সবগুলো খবরের কাগজের প্রথম পাতায় সে খবর ছাপা হয়েছিল। মটু যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তবে ধরে নিতে হয় টাকার বিনিময়ে অ্যালেক্সই খুনটা করেছে। ইন্টারপলের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের পুলিশ ওকে খুঁজছে। কেন? ও কি আরও কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত? আরও খুন করেছে ও?

পুলিশের ভয়ে নয়, অন্য কারও ভয়ে কেঁচো হয়ে আছে মটু। কারা ওরা?

গ্রসমুনস্টার চার্চের টুইন বেল টাওয়ার দুটোকে রূপকথার রাজপ্রাসাদের মত দেখাচ্ছে ফ্লাড লাইটের মায়াবী আলোয়। শতাব্দীর পুরানো কাঠামোটা চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়।

ব্রিজ পার হয়ে শহরের নতুন অংশে ঢুকল ওরা। এদিকের রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ভিড়ও বেশি। ফুটপাতে তিল ধারণের জায়গা

নেই, রাস্তায় শুঁয়ো পোকার মত গাড়ির লাইন।

অ্যালেক্স কোনদিকে তাকাচ্ছে না, শূন্য চোখ মেলে শুধু চেয়ে আছে। কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে ভেতরটা। নিজেকে খুঁজে বের করার যে অদম্য উৎসাহ ওকে তাড়িয়ে এনেছে এতদূরে, তা হঠাৎ করেই যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ও কি আসলেই একজন ভাড়াটে খুনী যাকে খুঁজে ফিরছে পুলিশ আর একদল মন্দ লোক? এটা জানার জন্যেই এতদূরে এসেছে সে?

হঠাৎ করেই ওর চমক ভাঙল। ওদের ঠিক পাশে একটা পুলিশের গাড়ি। পুলিশ মেগাফোনে দুর্বোধ্য স্থানীয় ভাষায় কিছু নির্দেশ দিচ্ছে, ডান হাতে ইশারা করছে গাড়ি থামাতে।

নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়েছে মেয়েটা। পেছনে পুলিশের গাড়ি দেখে হেডলাইট বন্ধ করে বাঁ দিকের ফ্লাশার অন্ করে দিয়েছে। অথচ বাঁ দিকে মোড় নেবার কোন উপায় নেই, যেহেতু রাস্তাটা ওয়ান-ওয়ে। একে হেডলাইট নেই, আবার বেআইনি ভাবে বাঁ দিকে মোড় নেবার চেষ্টা—এত কাছ থেকে পুলিশ লক্ষ না করেই পারে না।

ছোঁ মেরে হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল অ্যালেক্স। তারপর ঝুঁকে পড়ে বন্ধ করে দিল ফ্লাশার, এক হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছে মিশেলের কব্জি।

'খুন করে ফেলব তোমাকে, মেয়ে!' হিসিয়ে ওঠেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পুলিশের উদ্দেশ্যে অপ্রস্তুত হাসি হাসল অ্যালেক্স, 'দুঃখিত, অফিসার। আমরা বিদেশী, ট্যুরিস্ট! ট্র্যাফিক সিগন্যাল বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছে!'

পুলিশ দু'জন খুব বেশি হলে ফুট তিনেক দূরে, পাথরের মত

ভাবলেশহীন মুখে স্টিয়ারিঙ ধরে আছে মিশেল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার নিজেদের আলাপে মগ্ন হয়ে গেল পুলিশ দু'জন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অ্যালেক্স।

'আমি···আমি ঠিক বুঝতে পারিনি,' ফুঁপিয়ে উঠল মিশেল, ভয়ে সাদা হয়ে গেছে চেহারা। 'উঃ! ব্যথা পাচ্ছি···হাত ছাড়ো!'

হাত ছেড়ে দিল অ্যালেক্স। 'দোষ করেছ, আবার মিথ্যে কথা বলছ সাহস তো তোমার কম নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটাও একটু খরচ কোরো, নাহলে নিজেই খরচ হয়ে যাবে।' নিজের আসনে হেলান দিয়ে বসল অ্যালেক্স, তবে মিশেলের দিক থেকে চোখ সরাল না।

গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা। লাওয়েনস্ট্রাসে চওড়া রাস্তা। আধুনিক আকাশ-চাঁছা বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে ইঁট-কাঠের তৈরি নিচু প্রাচীন বাড়িগুলো স্যান্ডউইচ হয়ে আছে। দু'পাশের বাড়িগুলোর নাম্বার পড়তে পড়তে এগুচ্ছে ওরা। বাঁ পাশে একইরকম দেখতে এক সারি ফ্ল্যাটবাড়ি। চারতলা, জানালায় ভারি কাঠের ফ্রেম, সরু লোহার সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই অ্যালেক্সের মনে পড়ে গেল অনেকটা এরকমই দেখতে এক সারি ফ্ল্যাটের কথা। তবে এটা নয়। ওই বাড়িগুলো পুরানো, জানালায় ভাঙা কাঁচ, জংধরা লোহার ফ্রেম—নোংরা, গরিব এলাকা। জুরিখে···হ্যাঁ, জুরিখেই। তবে এদিকে নয়, জুরিখের প্রাচীন অংশে। অবহেলিত বস্তি এলাকা, বাইরের লোকজন ওদিকে যায় না।

'স্টেপ ডেকস্ট্রাসে,' নিজের মনেই বলে উঠল অ্যালেক্স, সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে ছবিটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। 'হ্যাঁ, একটা দরজা···উৎকট লাল রং এখানে সেখানে চটে গেছে। একটা বোর্ডিঙহাউস···স্টেপ ডেকস্ট্রাসে এলাকায়।'

'কি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মিশেল।

'কিচ্ছু না,' মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বর্তমানে ফিরে এল অ্যালেক্স, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। 'ওই যে, ওটাই বত্রিশ নাম্বার। গাড়ি থামাও।'

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পা'টা পরীক্ষা করল অ্যালেক্স, এখনও একটু একটু ব্যথা আছে। মিশেল নামতেই ওর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে নিল।

'হাঁটতে যখন পারছ তখন গাড়ি চালাতে অসুবিধা কোথায়?' রাগ রাগ কণ্ঠে টিপ্পনি কাটল মিশেল।

'অসুবিধা হয়ত হবে না।'

'তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও, যা বলেছ সবই তো করেছি!'

'যা বলিনি তাও করেছ, করোনি?'

'কেন বুঝতে পারছ না আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না?' আমি বিদেশী, শুধু শুধু জুরিখে এসে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে চাই না। দু'একদিনের মধ্যেই আমাকে ক্যানাডায় ফিরে যেতে হবে। কেনইবা শখ করে ঝামেলা বাড়াব? যেতে দাও আমাকে, দয়া করো!'

'তা হয় না।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না!'

'বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না, তোমাকে আমার দরকার।'

'দরকার! কিসের জন্যে?'

'দরকারটা একটু উদ্ভট ধরনের। আমার ড্রাইভার্স লাইসেন্স নেই। লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি রেন্ট করতে পারব না।'

'এই গাড়িটা তো আছে, আবার গাড়ি রেন্ট করতে চাও কেন?'

'এ গাড়িটা আর বড়জোর ঘণ্টাখানেক নিরাপদ। গাড়ির মালিক

হোটেল থেকে বের হলেই গাড়ির খোঁজ পড়বে। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ গাড়িটা খুঁজবে।'

ভীত চোখের কোল বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নেমে এল মিশেলের চিবুকে, 'আমার ভয় লাগছে! মোটা লোকটা কি বলতে চেয়েছে আমি জানি। এর চেয়েও বেশি কিছু জেনে ফেললে তুমি আমাকে খুন করবে, তাই না?'

'তুমি যা বুঝেছ, আমিও ঠিক সেটুকুই বুঝেছি। হয়ত তোমার চেয়েও কম বুঝেছি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, এসো।' এক হাতে মিশেলের বাহু আঁকড়ে অন্য হাতে রেলিঙ ধরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল অ্যালেক্স, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে।

দু'নাম্বার মেইলবক্সের নিচে নামটা লেখা আছে—এম. ব্যাকোফেন। ওপরের বেলটা না বাজিয়ে ডান পাশের পরপর চারটা বেল চেপে ধরল অ্যালেক্স। সঙ্গে সঙ্গে স্পিকারে কয়েকটা গলা ভেসে এল, জানতে চাইছে কে এসেছে। কোন একজন প্রশ্ন না করেই বাযার চেপে দরজার লক্ খুলে দিল। অ্যালেক্স দরজা খুলে মিশেলকে ঠেলে দিল ভেতরে, নিজেও ঢুকল। ওপরে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। দেয়ালের গায়ে মিশে দাঁড়াল ওরা। কিন্তু লোকটা নামল না, কয়েকবার কারও নাম ধরে চেঁচিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেল। হয়ত কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ব্যাকোফেন দোতলায় থাকে। মেইলবক্সে ফ্ল্যাটের নাম্বার লেখা ছিল, দুইয়ের সি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দোতলায় উঠে এল অ্যালেক্স। মেয়েটা ঠিকই বলেছিল, একা হলে মাথার বোঝা অনেকটা কমে যেত। কিন্তু উপায় নেই, একা শহর থেকে বের হবার ক্ষমতা এখন

আর ওর নেই।

পোর্ট নোয়ায় শেষ ক'টা দিন বসে বসে শুধু ম্যাপ মুখস্থ করেছে। এখান থেকে লুকার্ন একঘণ্টার রাস্তা, বার্ন যেতে লাগবে আড়াই কি তিন ঘণ্টা। যে কোন একটা শহরে যেতে পারে ও, মাঝপথে মেয়েটাকে নামিয়ে দিলেই হবে। সঙ্গে প্রচুর টাকা আছে, লুকিয়ে পড়তে অসুবিধে হবে না। শুধু শহর থেকে বেরুনো পর্যন্ত মেয়েটাকে দরকার হবে।

কিন্তু তার আগে ব্যাকোফেনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

এম. ব্যাকোফেন। দরজায় নাম্বারের নিচেই নামটা লেখা। বেল না বাজিয়ে মিশেলকে টেনে নিয়ে দরজার সামনে থেকে সরে গেল অ্যালেক্স।

'তুমি জার্মান জানো?' প্রশ্ন করল অ্যালেক্স।

'না।'

'মিথ্যে বলো না।'

'আশ্চর্য! মিথ্যে বলব কেন?'

একটু ভেবে নিয়ে অ্যালেক্স আবার বলল, 'বেল বাজাও। দরজা না খুলে যদি জানতে চায় কে, তাহলে বলো গোল্ডেন ব্রিজ থেকে জরুরি বার্তা নিয়ে এসেছ।'

'যদি দরজার নিচে দিয়ে ঠেলে দিতে বলে?'

অ্যালেক্সের চোখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠল। 'দারুণ! তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী।'

'আমি কিচ্ছু জানতে চাই না, কিচ্ছু দেখতে চাই না...'

'জানি,' ওকে থামিয়ে দিল অ্যালেক্স। 'তুমি ওই ঘুমপাড়ানী কনফারেন্সে ফিরে যেতে চাও। তবে এখন আমাকে একটু সাহায্য করো। যদি দরজার নিচে ঠেলে দিতে বলে, তাহলে বলো বার্তাটা

মৌখিক, লিখিত কিছু নেই। চেহারার বর্ণনা দেয়া আছে, না দেখে কিছুতেই বলা যাবে না।'

'যদি জানতে চায় কি রকম চেহারা?'

'আর একবার তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি,' হাসল অ্যালেক্স। 'যদি ওরকম করে, তবে সোজা হাঁটা দেবে।'

মিশেল দু'পা সরে গিয়ে বেল টিপল। ভেতরে কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে, কেউ যেন মেঝেতে কিছু ঘষটাচ্ছে। শব্দটা আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। থেমে গেল।

'কে?' স্থানীয় ভাষায় কেউ জানতে চাইল।

'দুঃখিত, আমি জার্মান জানি না,' মিশেল বলল।

'ও, ইংলিশ! কি দরকার এখানে? কে তুমি?'

'গোল্ডেন ব্রিজ থেকে একটা বার্তা নিয়ে এসেছি।'

'দরজার নিচে দিয়ে ঠেলে দাও।'

অ্যালেক্সের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে চাইল মিশেল, একটুও না ঘাবড়ে বলল, 'বার্তাটা লিখিত নয়, আমাকে চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে—একমাত্র তাকেই বলার নির্দেশ দেয়া আছে।'

পাঁচ সেকেন্ড পর দরজাটা খুলে গেল। নিমেষে দরজায় এসে দাঁড়াল অ্যালেক্স।

'পাগল হয়ে গেছ তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল হুইল চেয়ারে বসা বুড়ো এক লোক, দুটো পা-ই হাঁটুর ওপর থেকে কাটা। 'বেরিয়ে যাও! এক্ষুণি চলে যাও এখান থেকে!'

'ওই এক কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি,' একটানে মিশেলকে ঘরের ভেতর টেনে এনে দরজাটা বন্ধ করে দিল অ্যালেক্স।

আদেশ করতেই একটুও আপত্তি না করে মিশেল বেডরুমে ঢুকে দরজা

বন্ধ করে দিল। পঙ্গু ব্যাকোফেন আতঙ্কের চরম সীমায় পৌঁছেছে, রক্ত সরে গেছে চেহারা থেকে।

'কি চাও? কি চাও তুমি আমার কাছে?' রাগে আর আতঙ্কে কাঁপছে বুড়োর গলা। 'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমাকে আর এর মধ্যে টানবে না! যথেষ্ট হয়েছে, আমি আর এই ধান্ধায় নেই! তোমার খোঁজে এখানেও ওরা এসেছিল! কেমন করে জানি না ওরা টের পেয়ে গেছে! তারপর তুমিও এসে হাজির হয়েছ! আমি আর নেই, শেষ হয়ে গেছি! শেষ হয়ে গেছি!'

'যতটা সামলাতে পারবে তারচেয়ে বেশি ঝুঁকি তুমি নিয়েছ, ব্যাকোফেন।' হুইল-চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে অ্যালেক্স চিন্তা করছে কিভাবে বুড়োর পেট থেকে কথা বের করা যায়।

'তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত আমি ভালই ছিলাম। যুদ্ধে পা হারিয়েছি, কিন্তু জীবনে শান্তির অভাব ছিল না। বন্ধু-বান্ধবের দয়ায় বেঁচে আছি, কিন্তু কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। তারপরই তোমার খপ্পরে পড়লাম...'

'কাজের কথায় আসা যাক,' বাধা দিল অ্যালেক্স। 'এনভেলাপ থেকে শুরু করি, গোল্ডেন ব্রিজে আমাদের বন্ধুকে যেটা দিয়েছিলে তুমি। এনভেলাপটা তোমাকে কে দিয়েছিল?'

'কে আবার? মেসেঞ্জার বাসায় ডেলিভারি দিয়েছে।'

'কোত্থেকে এসেছিল এনভেলাপটা?'

'আমি কেমন করে জানব? অন্যান্য ডেলিভারির মত ওটাও একটা বাক্সে করে এসেছিল। তোমার অনুরোধেই বাক্স থেকে বের করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তুমিই বলেছিলে তুমি এখানে আসতে পারবে না।'

'তুমি এনভেলাপটা খুলেছিলে।'

'কক্ষণো না!'

'তাহলে ভেতরে টাকা কম ছিল কেন?'

'হয়ত ওরাই কম পাঠিয়েছে!' তারপর একটু ভেবে বলল, 'তুমি মিথ্যে বলছ। পুরো টাকা না পেলে কাজটা তুমি হাতে নিতে না। কাজ হয়ে গেছে, এখন কেন টাকার হিসেব করছ? এখানেই বা কেন এসেছ?'

প্রতিটা শব্দ অ্যালেক্সের হৃদয়ের গভীরে আঘাত করল। কি হচ্ছে এসব? সত্যিই কি ও ভাড়াটে এক খুনী? কি করবে এখন সে? কোথায় যাবে? পৃথিবীতে কি ওর কেউ নেই? বাবা-মা? ভাই-বোন? দু'একজন বন্ধু? ভীষণ একা আর অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। কে আমি? কোথায় আমি?

চোখের কোণে কি যেন নড়ে উঠল। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল অ্যালেক্স। ব্যাকোফেনের ডান হাতটা সীটের নিচ থেকে বেরিয়ে এল দ্রুত, মুঠোয় চেপে ধরে আছে একটা শর্ট ব্যারেল্ড্, রিভলভার, দু'চোখে প্রচণ্ড রাগ আর ঘৃণা। অ্যালেক্স নিজের রিভলভার বের করার আগেই গর্জে উঠল ব্যাকোফেনের অস্ত্র। অ্যালেক্সের বাঁ কাঁধে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল, মাথাটাও মনে হল চুরমার হয়ে গেছে। উঃ! ঈশ্বর!

কাতরে উঠে ডান দিকে ঝাঁপ দিল অ্যালেক্স, কার্পেটের ওপর গড়িয়ে গেল। পড়ার আগে ব্যাকোফেনের দিকে একটা ভারি টেব্‌ল্-ল্যাম্প ছুঁড়ে মেরেছে। গড়িয়ে হুইল চেয়ারের কাছে পৌঁছে গেল, অক্ষত ডান কাঁধে ধাক্কা মারল ভারি চেয়ারটার পেছনে। সামনের দিকে উবু হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেল বুড়ো মানুষটা, ইতিমধ্যে অ্যালেক্স

রিভলভার বের করে ফেলেছে।

'তোমার মৃতদেহের জন্যে আমাকে পুরস্কার দেবে লুকা!' উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থাতেই ডান হাতে রিভলভার তাক করার চেষ্টা করছে ব্যাকোফেন। 'আমাকে কবরে পাঠাবার শক্তি তোমার নেই! তোমাকেই শেষ করব আমি! বড়লোক হয়ে যাব! লুকা কথার খেলাপ করে না!'

বাঁ দিকে ঝাঁপ দিয়েই গুলি করল অ্যালেক্স। নিথর হয়ে গেল ব্যাকোফেন, গলা দিয়ে গলগল করে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসছে। মরে গেছে লোকটা।

বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মিশেল, দৃশ্যটা দেখে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল ঘর কাঁপিয়ে।

প্রচণ্ড ব্যথায় কেঁপে কেঁপে উঠছে অ্যালেক্স, চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধের মত বাথরুমে ছুটে গেল, আছড়ে পড়ল বেসিনের ওপর। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল ক্যাবিনেটের আয়না। হাতড়ে হাতড়ে তুলো, গজ আর টেপ তুলে নিল।

কে চিৎকার করছে? ও হ্যাঁ…মেয়েটা…কি যেন নাম? মাথা ঝাঁকিয়ে অবসন্ন ভাবটা কাটাতে চাইল অ্যালেক্স। মিশেল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মেয়েটার নাম মিশেল। আটকাতে হবে…মেয়েটাকে পালাতে দেয়া যাবে না। ওকে যে ভীষণ দরকার!

চিৎকার লক্ষ্য করে আবার লিভিঙরুমে ফিরে এল অ্যালেক্স। পালাবার কথা ভুলে গেছে মিশেল, দু'হাতে মুখ-চোখ ঢেকে একনাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। অ্যালেক্সের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসছে, আবার দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। মিশেলের হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে রওনা হল অ্যালেক্স, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে এখান

থেকে।

'খুন করেছ তুমি পঙ্গু লোকটাকে!' পাগলের মত চ্যাঁচাচ্ছে মিশেল, 'বুড়ো লোকটা...'

'চুপ করো!' ধমকে উঠল অ্যালেক্স। মিশেলকে টানতে টানতে বেরিয়ে এল করিডরে। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, ঝাপসা দেখছে চোখে। আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে লোকজন বেরিয়ে এসেছে গোলমাল শুনে। অ্যালেক্সের হাতে রিভলভার দেখে চ্যাঁচামেচি-ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল, ঝটপট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজাগুলো। কোন কিছুই স্পর্শ করছে না ওকে, মনে হচ্ছে যেন পানির নিচে হাঁটছে। অসাড় হয়ে আছে গুলি খাওয়া কাঁধটা, রক্তে ভিজে গেছে শার্ট। শরীরের অর্ধেক ভার চাপিয়ে দিয়েছে মিশেলের ওপর, এক হাতে দেয়াল ধরে ধরে হাঁটছে। অবশেষে একসময় রাস্তায় গাড়ির কাছে পৌঁছল ওরা। দরজা খুলে মিশেলকে ঠেলে দিল ড্রাইভার্স সীটে, পকেট থেকে চাবি বের করে ছুঁড়ে দিল।

সীটে বসে আঘাতগুলো পরীক্ষা করল অ্যালেক্স। মাথার ক্ষতটা গুরুতর নয়, বুলেট শুধু চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। তবে কাঁধের আঘাতটা যথেষ্ট ভোগাবে। তুলো আর গজ দিয়ে দ্রুতহাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করল অ্যালেক্স।

'কি হল? গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছ না কেন?'

'কোনদিকে যাব?' মিশেল এখন আর চ্যাঁচাচ্ছে না, বরং বেশ শান্তভাবেই প্রশ্নটা করল। হঠাৎ করেই মেয়েটা এমন শান্ত হয়ে গেল কেন?

কিন্তু চিন্তা করতে পারছে না অ্যালেক্স, ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ছে শরীর। 'স্টেপডেকস্ট্রাসে...' বিড়বিড় করে উঠল। মনের পর্দায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও ভাঙাচোরা এক সারি বাড়ি, মরচে ধরা লোহার ফ্রেম,

লাল রঙের ভারি একটা দরজা। 'স্টেপডেকস্ট্রাসে...' আবার বলে উঠল সে।

এখনও কেন মেয়েটা এঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছে না? বহু কষ্টে চোখ খুলল অ্যালেক্স। ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় রিভলভারটা কোলে রেখেছিল ও, মিশেল আলগোছে সেটা তুলে নিচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলভারটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল অ্যালেক্স, ঝনঝন শব্দ তুলে সেটা পড়ে গেল সীটের নিচে। প্রচণ্ড শক্তিতে ধাক্কা দিল মিশেল। দুর্বল অ্যালেক্স কোন প্রতিরোধই করতে পারল না, মাথাটা জোরে ঠুকে গেল জানালার কাঁচে। দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল মিশেল, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। অসহায় অ্যালেক্সের চোখের সামনে দিয়ে লাওয়েনস্ট্রাসে ধরে দূরে মিলিয়ে গেল মেয়েটা!

গাড়ি চালাবার প্রশ্নই ওঠে না, এই গাড়ির আশেপাশে থাকাও এখন বিপদজনক। রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল অ্যালেক্স ফুটপাত ধরে। রাস্তার মোড়েই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। স্টেপডেকস্ট্রাসে যেতে হবে ওকে।

মিশেল ডিয়ন রাস্তার মাঝখান ধরে ছুটছে। চওড়া রাস্তা, গাড়িঘোড়া এমনিতেই কম। কেউ ওকে লক্ষ করছে না। প্রাণপণে চিৎকার করছে সে, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে দু'হাত মাথার ওপরে তুলে নাড়ছে। যারা ওকে লক্ষ করছে তারা না থেমে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাত বাড়ছে, সাধ করে কে ঝামেলা নিতে চায়! হেডলাইট অফ করা বিশেষ একটা গাড়ির দু'জন আরোহী কিন্তু ওকে লক্ষ করতে ভুলল না।

'এটাই কি সেই মেয়েটা?' প্যাসেঞ্জার সীটে বসা লোকটা ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল। 'ব্যাকোফেন সামনেই একটা

ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে।'

'গাড়ি থামাচ্ছি। মেয়েটা আর একটু কাছে আসুক, তখন চেনা যাবে। নীল সিল্কের পোশাক পরনে থাকার কথা···আরে! এটাই সেই মেয়ে!'

'রেডিওতে খবর পাঠাবার আগে নিশ্চিত হয়ে নেয়া দরকার।'

গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল লোক দু'জন। দু'জনের পরনেই দামি বিজনেস স্যুট, মার্জিত চেহারা। মিশেল কাছে আসতেই ওরা দৌড়ে এগিয়ে গেল।

ড্রাইভার ভদ্রলোক স্থানীয় ভাষায় কিছু প্রশ্ন করল।

'হেল্প মি!' ইংরেজিতে চিৎকার করে উঠল মিশেল, 'আমি···আমি জার্মান জানি না! পুলিশ ডাকুন! পুলিশ!'

'আমরাই পুলিশ,' সুন্দর ইংরেজিতে মেয়েটাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল লোকটা। 'জুরিখ সিচারহেইটপুলিযি। ফ্রলিন, ক্যারিলন দ্যু লাক থেকে আপনিই পালিয়ে গিয়েছিলেন?'

'আমাকে কিডন্যাপ করেছিল লোকটা!' এর মধ্যেও রাগে জ্বলে উঠল মিশেল, 'ইচ্ছে করে তো আর পালাইনি! আমাকে আটকে রেখেছিল!'

'লোকটা এখন কোথায়?'

'আমি গাড়ি থেকে নেমে পালিয়েছি। ও তখন গাড়িতেই বসে ছিল। আহত···গুলি খেয়েছে···' হাত বাড়িয়ে লাওয়েনস্ট্রাসের দিকে ইঙ্গিত করল, 'ওদিকে। দুই ব্লক কি তিন ব্লক দূরে। ছাইরঙা একটা সিত্রোঁয়া। ওর কাছে রিভলভার আছে!'

'আমাদের কাছেও আছে, চিন্তা করবেন না, ফ্রলিন। আসুন, গাড়িতে উঠে পড়ুন। এখন আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ, কেউ কোন ক্ষতি

করতে পারবে না।'

একটু এগুতেই ছাইরঙা সিত্রোঁয়াটাকে পাওয়া গেল, ভেতরে কেউ নেই। তবে ফুটপাতে ছোটখাট একটা ভিড়, উল্টোদিকের বাড়িটাকে ঘিরেই উত্তেজনা। জানালার কাঁচ নামিয়ে ড্রাইভার এক মহিলাকে ডাকল। কিন্তু মহিলা তেমন কিছু বলতে পারল না।

ড্রাইভার এবার মিশেলের দিকে ফিরল, 'এই বাড়িটাতে ব্যাকোফেন নামের এক লোক থাকে। লোকটা কি ওর সাথে দেখা করার কথা বলেছিল?'

'ওই লোকটাকে খুন করেছে সে! পঙ্গু বুড়ো লোকটা...'

স্থানীয় ভাষায় দ্রুত নিজেদের মধ্যে কথা বলল লোক দু'জন। তারপর প্যাসেঞ্জার সীটে বসা লোকটা ড্যাশবোর্ড থেকে ছোঁ মেরে মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। চলতে শুরু করেছে গাড়ি।

পেছন থেকে সামনের সীট আঁকড়ে ধরল মিশেল, 'আরে আরে! কোথায় যাচ্ছেন? একটা খুন হয়েছে ও বাড়িটায়...'

'অন্যরা এক্ষুণি পৌঁছে যাবে। আমাদের দায়িত্ব খুনীকে গ্রেপ্তার করা। আপনি বলেছেন লোকটা আহত, তারমানে খুব সহজে পালাতে পারবে না। হয়ত আশেপাশেই আছে,' বলতে বলতে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার গাড়ি থামাল ওরা, মাইক্রোফোনে অনবরত কথা বলছে স্থানীয় ভাষায়। মিশেলের দিকে পিছন ফিরে বলল, 'আমাদের ওপরওয়ালা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে, উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন। এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছেন উনি।'

চোখ বন্ধ করে সীটে গা এলিয়ে দিল মিশেল। এখনও গা-হাতপা কাঁপছে।

প্যাসেঞ্জার সীটে বসা লোকটা গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে চ্যাপ্টা একটা বোতল বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'ফ্রলিন, কয়েকটা চুমুক দিন, একটু ভাল বোধ করবেন। দুঃখিত, গাড়িতে কোন কাপ বা গ্লাস নেই। মেডিকেল এমার্জেন্সির জন্যেই আমরা ব্র্যান্ডি সঙ্গে রাখি।'

ফ্যাকাসে হেসে হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল মিশেল, 'ধন্যবাদ, আমি টিটোটালার। কোনরকম অ্যালকোহল খাই না। তবে সবকিছুর জন্যে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি কোনদিন অটোয়ায় বেড়াতে আসেন, তবে আমার মেহমান হয়ে থাকবেন। আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনারা, কোনদিন সে ঋণ শোধ করতে পারব না।'

'ধন্যবাদ, ফ্রলিন,' মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

তুলো আর গজ দিয়ে বাঁধা কাঁধের ব্যান্ডেজটা পরীক্ষা করল অ্যালেক্স বাথরুমের নোঙরা ঝাপসা আয়নায়। যেমনটি কল্পনা করেছিল, স্টেপডেকস্ট্রাসের বোর্ডিং হাউসটা ঠিক তেমনটিই। পুরানো মর্চে ধরা লোহার রেলিং, লাল রঙচটা দরজা—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়বে। ঘর ভাড়া করার সময় ডেস্কের মাঝবয়েসী লোকটা কোন প্রশ্ন করেনি। আড়চোখে ওর কাঁধের ব্যান্ডেজটা দেখে নিয়ে সমবেদনার সুরে বরং বলেছিল, 'দরকার হলে একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসা যায়, যে মুখ খুলবে না।'

'এখন নয়, দরকার হলে পরে জানাব,' মাথা নেড়ে নিষেধ করেছে অ্যালেক্স।

আঘাতগুলো গুরুতর নয়। ডাক্তার ডাকার ঝুঁকি এখন না নিলেও চলবে। তবে অবশ হয়ে গেছে জায়গাগুলো। একদিক থেকে তাতে উপকারই হয়েছে, ব্যথাটা অন্তত টের পাওয়া যাচ্ছে না। যদি

ইনফেকশন দেখা দেয় বা আবার রক্ত ঝরতে শুরু করে, তাহলে অবশ্য ডাক্তার না ডেকে উপায় থাকবে না। কাঁধের আঘাতটা বেশ গভীর, ওর কর্মক্ষমতা লোপ পাবার মত গুরুতর নয়। একটু বিশ্রাম নিলেই মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবে। ভোর হবার আগেই জুরিখ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, উপযুক্ত সম্মানী পেলে বিল্ডিং ম্যানেজার লোকটা ওকে সাহায্য করবে, যতদূর মনে হয় সেটাই ওর প্রধান পেশা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিছানার দিকে এগুলো অ্যালেক্স। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। শক্ত ম্যাট্রেসে পিঠ ঠেকতেই ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করল শরীরের মাংসপেশী।

চোখ বুজল অ্যালেক্স। সঙ্গে সঙ্গেই যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল ব্যাকোফেনের কণ্ঠ…

তুমি মিথ্যে বলছ…

পুরো টাকা না পেলে কাজটা তুমি হাতে নিতে না…

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোরটা কাটাতে চাইল অ্যালেক্স। পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে ঘুরে শুল। ঠিক যখনই ঘুমটা লেগে এল, আবার ভেসে এল ভৌতিক সেই কণ্ঠ। আতঙ্কে উঠে বসল অ্যালেক্স, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে—কাঁপছে গোটা শরীর।

তোমার মৃতদেহের জন্যে আমাকে পুরস্কার দেবে লুকা…

লুকা কথার খেলাপ করে না…

লুকা!

সিত্রোঁয়ার সামনে এসে দাঁড়াল কালো একটা সেডান। সেদিকে তাকিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা মিশেলকে বলল, 'চলুন, এবার যাওয়া যাক। আমাদের বস্ চলে এসেছেন।'

বত্রিশ নাম্বার লাওয়েনস্ট্রাসের সামনে পুলিশের গাড়ির ভিড়, মিনিট পাঁচেক আগে একটা অ্যাম্বুলেন্সও এসেছে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু।

গাড়ি থেকে মিশেল নেমে দাঁড়াতে লোকটা আলতো করে ওর কনুই ধরল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সেডানের কাছে। পেছনের দরজা খুলে মিশেলকে ইঙ্গিত করল উঠে বসার জন্যে। ভেতরে ঢুকে পাশে বসা লোকটার দিকে চাইতেই মিশেলের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

স্ট্রিটল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে চশমার পাতলা সোনালী ফ্রেম।

'আপনি!...হোটেলে আপনিই গুলি ছুঁড়ছিলেন! আপনি ওদের দলের...'

বিরক্তির ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ক্লান্ত। 'হোটেলে আমিই ছিলাম, ঠিকই দেখেছেন আপনি। আমি জুরিখ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে আছি। আমার লোকেরা দক্ষ মার্কসম্যান, আপনার গায়ে যাতে গুলি না লাগে সে ব্যাপারে পূর্ণ সাবধানতা নেয়া হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, আপনার নিরাপত্তার খাতিরেই লোকটাকে ধরাশায়ী করতে পারিনি আমরা।'

লজ্জা পেল মিশেল অযথা চমকে ওঠার জন্যে, 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। দ্বিতীয়বার আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনারা।'

চট করে কাজের কথায় চলে এল চশমা পরা লোকটা, 'তাহলে আপনি শেষবার ব্যাটাকে দেখেছেন ওই গাড়িটার সামনের সীটে বসা আবস্থায়, তাই না?'

'হ্যাঁ। লোকটা আহত হয়েছে।'

'কতটা গুরুতর?'

'মনে হয় ভালভাবেই আহত হয়েছে। আবোল-তাবোল বকছিল। কাঁধে...' মানে পোশাকে রক্ত দেখেছি। আচ্ছা, ওই লোকটা কে? নাম জানা গেছে?'

'একটা নয়, অসংখ্য নাম আছে ওর। তবে আপনি নিজেই তো দেখেছেন ভয়ঙ্কর এক খুনী লোকটা। আর একটা খুন করার আগে যে করেই হোক ওকে থামাতে হবে। গত কয়েক বছর ধরেই ওর পিছু ধাওয়া করছি আমরা। শুধু আমরা নই; আরও এগারোটা দেশের পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ল। বদমাশটা জুরিখেই আছে, তাছাড়া আহত। এই অবস্থায় কত দূরেই বা যেতে পারবে! শহর থেকে বের হবার কথা কিছু আলোচনা করেছিল নাকি?'

'বলছিল আমার নামে গাড়ি রেন্ট করবে। ওর নাকি ড্রাইভার'স লাইসেন্স নেই।'

'ডাঁহা মিথ্যে কথা। ওর সঙ্গে সবসময় কয়েক সেট পরিচয়পত্র থাকে। আপনাকে দিয়ে গাড়ি রেন্ট করিয়ে তারপর স্রেফ খতম করে দেয়ার প্ল্যান ছিল আর কি। প্রথম থেকে বলুন তো হোটেল থেকে বেরিয়ে কোথায় কোথায় গেছে ব্যাটা? কার কার সঙ্গে দেখা করেছে?'

'গোল্ডেন ব্রিজ নামের একটা রেস্টোরান্টে গিয়েছিল। মোটা এক লোকের সঙ্গে কথা বলেছে...খুব ভীত মনে হচ্ছিল লোকটাকে।' পরবর্তী পঁচিশ মিনিট লোকটা মিশেলকে একের পর এক প্রশ্ন করে গেল। নোটবুকে টুকে নিল দরকারি তথ্য। অবশেষে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল, 'অস্বাভাবিক আচরণের কথা বলছেন, ঠিক কি ধরনের আচরণ করছিল সে?'

'উল্টোপাল্টা কথা বলছিল, মানে জ্বরের ঘোরে মানুষ যেভাবে

প্রলাপ বকে সেরকম,' হঠাৎ করেই একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিশেলের বাদামী চোখ জোড়া, 'স্টেপডেক...হ্যাঁ, স্টেপডেকস্ট্রাসে! বারবার এ নামটা আওড়াচ্ছিল। বলছিল ভাঙা জানালা...পুরানো বাড়ি...আরও কি কি যেন...'

'মনে করার চেষ্টা করুন,' সোজা হয়ে বসল লোকটা।

'স্টেপডেকস্ট্রাসের ওপর একটা বোর্ডিংহাউস। হ্যাঁ, তা-ই বলেছিল লোকটা!'

দ্রুত ড্রাইভারের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় বাক্যবিনিময় করল চশমাধারী। পরমুহূর্তেই সামনের দিকে লাফ দিল কালো সেডান। গন্তব্য—স্টেপডেকস্ট্রাসে।

আট

মৃদু একটা শব্দ। ঘরের বাইরে কোথাও। চোখ খুলল অ্যালেক্স। পূর্ণ সজাগ।

ঘরের বাইরে কাঠের সিঁড়িতে শব্দটা হয়েছে। কেউ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে বা নামছে, ক্যাঁচক্যাঁচে শব্দ উঠতে থেমে গেছে। কিন্তু থামল কেন? বোর্ডাররা কেউ অন্যের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

আবার হল শব্দটা। ক্যাঁচক্যাঁচ। এবার আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। পা টিপে টিপে কেউ আসছে এদিকেই। বালিশের পাশে রাখা

রিভলভারটা খপ্ করে তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল অ্যালেক্স। দরজার পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে কানপেতে শুনতে চেষ্টা করল। একজন লোক। এখন আর পায়ের শব্দ গোপন করার চেষ্টা করছে না, দৌড়ে আসছে। আর কোন সন্দেহ নেই।

প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল দরজা। তৈরি ছিল অ্যালেক্স। শরীরের পুরো শক্তি খরচ করে লাথি কষাল দরজার কপাটে, চেপে ধরল গোটা শরীর দিয়ে। দরজা আর চৌকাঠের মাঝে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেছে আগন্তুক। খুব ধীরে ধীরে দরজাটা আলগা করে আগন্তুকের সোনালী চুল খামচে ধরে শরীরটা ঘরের ভেতরে নিয়ে এল অ্যালেক্স। জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে। হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল মেঝেয়। শরীরটা আস্তে আস্তে মেঝেতে শুইয়ে দিল অ্যালেক্স।

দরজা বন্ধ করে কানখাড়া করে রইল। নাহ্, আর কোন শব্দ নেই। জ্ঞানহীন দেহটার দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করল—কে লোকটা? চোর? অথবা খুনী?

পুলিশ? বোর্ডিংহাউজের ম্যানেজার পুরস্কারের লোভে পুলিশকে খবর দেয়নি তো? লোকটার পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল অ্যালেক্স। মোটা অঙ্কের টাকা রয়েছে, নির্বিবাদে নিজের পকেটে ভরল সে। বেশ ক'টা ক্রেডিট কার্ড আর একটা ড্রাইভার্স লাইসেন্সও বেরুল। খুশি হয়ে উঠতে গিয়েও ক্রেডিট কার্ড আর ড্রাইভার্স লাইসেন্সের নাম পরীক্ষা করে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ক্রেডিট কার্ড আর লাইসেন্সের নাম ভিন্ন, একটার সঙ্গে অন্যটার কোন মিল নেই। এই লোক কিছুতেই পুলিশ হতে পারে না। তারমানে পেশাদার খুনী। কেউ ওকে পাঠিয়েছে এখানে। কে? কারা? অ্যালেক্স এখানে আছে তা জানল কেমন করে?

মেয়েটা? মেয়েটার সামনে বিড়বিড় করে রাস্তার নামটা বলে উঠেছিল সে। কিন্তু, নাহ্। স্পষ্টভাবে কিছুই ও বলেনি, মেয়েটার বোঝার কথা নয়। যদি বুঝেও থাকে, তাহলেও পেশাদার কোন খুনী নয়—এতক্ষণে পুলিশ পৌঁছে যেত।

গোল্ডেন ব্রিজের সেই মটু নয় তো? সে কি স্টেপডেকস্ট্রাসের এই বোর্ডিংহাউসটা চেনে? জানে অ্যালেক্স এখানে থাকে? চোখ বন্ধ করে চিন্তা করার চেষ্টা করল অ্যালেক্স। কেন মনে পড়ছে না কিছু? সত্যিই যদি স্মৃতিশক্তি আর ফিরে না আসে? মাথা ব্যথা করতে শুরু করল। ডক্টর টুক্সবেরীর কথা মনে পড়ে গেল—'নিজের সঙ্গে যতই যুদ্ধ করবে, ক্ষতি বাড়বে বই কমবে না···ধৈর্য ধরো···তাড়াহুড়ো কোরো না···'

চোখ খুলল অ্যালেক্স। সোনালী চুলওয়ালা লোকটাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করল। আশ্চর্য! জুরিখ থেকে বেরিয়ে যাবার এমন মোক্ষম সুযোগ হাতের মুঠোয় চলে এল নিজ থেকেই, অথচ এতক্ষণ একবারও সেটা মনে পড়েনি! ক্রেডিট কার্ড আর ড্রাইভার্স লাইসেন্স সহ ওয়ালেটটা পকেটে পুরে জ্ঞানহীন দেহটা খাটে তুলল অ্যালেক্স। বিছানার চাদরটা ছিঁড়ে লোকটাকে বেঁধে ফেলল আষ্টেপৃষ্ঠে ম্যাট্রেসের সঙ্গে, মুখের ভেতরেও গুঁজে দিল চাদরের কিছু অংশ যাতে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিৎকার করতে না পারে। বেশ ক'ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত। এর মধ্যেই অ্যালেক্স জুরিখ ছেড়ে চলে যাবে অনেক দূরে। যে-ই পাঠিয়ে থাকুক এই ভগ্নদূতকে, অজান্তে অ্যালেক্সের বিরাট উপকার করে বসেছে সে।

পোশাক পরেই ঘুমিয়েছে সে, শুধু কোটটা পরে নিল। নেবার মত আর কিছু সঙ্গে নেই। পায়ে এখনও চিনচিনে ব্যথা, তবে হাঁটতে অসুবিধা হবে না। কাঁধের ক্ষতটায় এখনও কোন অনুভূতি নেই, বেশ

কিছুটা জায়গা অবশ হয়ে আছে। মাথার ক্ষতটা দপদপ করছে। খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাতে হবে।

মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে বেল্টে গুঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অ্যালেক্স। কানখাড়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। প্যাসেজে ম্লান আলো জ্বলছে। ওপরতলায় কেউ হেসে উঠল। এছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। চারতলা বাড়ির তিনতলায় ছিল ওর ঘরটা। সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

নিরাপদেই দোতলার ল্যান্ডিঙে নেমে এল সে। কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ গোপন করার কোন উপায় নেই। কেউ যদি ওৎ পেতে থাকেও, দূর থেকেই অ্যালেক্সের পদধ্বনি শুনতে পাবে।

খসখসে শব্দ। শক্ত কাপড় বা কাগজের সঙ্গে কাঠের ঘর্ষণের শব্দ। সামনের কোন একটা ঘরে কেউ লুকিয়ে আছে। হাঁটার গতি না কমিয়ে যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে, প্যাসেজের সেদিকটায় উঁকি দিল অ্যালেক্স। তিনটে বন্ধ দরজা।

আরও এক পা সামনে এগুলো। প্রথমটা নয়, ওটা খালি ঘর। সিঁড়ির এত কাছে থাকার ঝুঁকি ওরা নেবে না। শেষ ঘরটাও নয়, কারণ ওটা প্যাসেজের শেষ প্রান্তে—দরকার হলে ওদিকে পালাবার রাস্তা পাওয়া যাবে না। তারমানে দ্বিতীয় দরজাটার ওধারেই অপেক্ষা করে আছে লোকটা।

একটু আগের সংগ্রহ করা পিস্তলটায় সাইলেন্সার লাগানো আছে বলে সেটাই বের করে নিল অ্যালেক্স। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চলে এল দ্বিতীয় দরজাটার কাছে।

একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে দরজাটা। স্থানীয় ভাষায় কেউ কিছু প্রশ্ন করল, পরমুহূর্তেই দরজাটা খুলে যেতে শুরু করল। ঝেড়ে লাথি কষল

অ্যালেক্স। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে পিছিয়ে গেল লোকটা, অ্যালেক্স ঢুকে গেল ভেতরে। দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক যুবক, হাতের পিস্তলটা উঠে আসছে ওপরের দিকে। কোন ঝুঁকি না নিয়ে যুবকের উরুতে গুলি করল অ্যালেক্স। আর্তচিৎকার করে মেঝেতে পড়ে গেল ছেলেটা, পিস্তলটা ছিটকে গেল দূরে। ওর বুকে পা দিয়ে দাঁড়াল অ্যালেক্স, হাতের পিস্তলটা চেয়ে আছে কপালের দিকে।

নিচু গলায় প্রশ্ন করল, 'নিচে ক'জন আছে?'

'কেউ না...আমরা দুজন...' যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে যুবক, 'আমাদেরকে ভাড়া করেছে...'

'কে?'

'তুমি ভাল করেই জানো কে।'

'লুকা?'

'নাম বলব না...মেরে ফেললেও না...'

'কেমন করে জানলে আমি এখানে আছি?'

'ব্যাকোফেন।'

'সে তো পটল তুলেছে।'

'আজ নয়, গতকাল জানিয়েছে তুমি এখানে গা-ঢাকা দাও।'

'মিথ্যে বলছ,' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল অ্যালেক্স, 'ব্যাকোফেন এই আড্ডা চিনত না।'

'ব্যাকোফেন ছাড়া কেউ তোমার চেহারা চেনে না, সে-ই খবর দিয়েছে,' নাক থেকে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে, ককিয়ে উঠল সে ব্যথায়।

'কেন, গোল্ডেন ব্রিজের ওই লোকটাও তো আমাকে চেনে।'

'তাকে আমরা চিনি না।'

'আমরা? আমরা মানে কারা?'

ঢোক গিলল যুবক, যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে ঠোঁটের দু'কোন, 'তোমাকে খুন করতে আসিনি আমরা। নির্দেশ আছে ধরে নিয়ে যাবার।'

'ধরে কোথায় নিয়ে যাবার কথা?'

'রেডিওতে সেটা জানাবার কথা। রেডিও আছে গাড়িতে।'

'দারুণ!' মৃদু হাসল অ্যালেক্স, 'তুমি শুধু বোকা নও, দ্বিতীয় শ্রেণীর গর্দভও। আমার জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থাও করে দিলে! তা কোথায় আছে গাড়িটা?'

'সদর দরজার ঠিক সামনে।'

'চাবি দাও,' রেডিওওয়ালা গাড়ি চিনতে অসুবিধা হবে না।

দু'হাতে বুকের ওপর থেকে অ্যালেক্সের পা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে দেয়ালের দিকে গড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল যুবক, 'না···কিছুতেই দেব না···'

ঝুঁকে পিস্তলটা ওর খুলিতে চেপে ধরল অ্যালেক্স, 'না দিয়ে যাবে কোথায়, চাঁদু?'

নিশ্চল হয়ে গেল যুবক, বাঁ হাতে ওর বুকপকেট থেকে চাবির ছড়াটা খুঁজে নিল অ্যালেক্স। চামড়ার কেসে তিনটে চাবি। ঘরের কোণ থেকে পিস্তলটা তুলে নিল, এটা সাইলেন্সার ছাড়া। মনটা খুঁতখুঁত করছে। দু'জন একসঙ্গে ওপরতলায় ওর ঘরে কেন হানা দিল না? সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল। চিন্তা করতে করতে পিস্তলটা বাঁ পায়ের মোজার মধ্যে গুঁজে নিল অ্যালেক্স। পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হল, মোজার শক্ত এলাস্টিক এঁটে ধরেছে পিস্তলটাকে, খুলে পড়বে না সহজে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল অ্যালেক্স, কাঁধের

ব্যথাটা বাড়ছে ধীরে ধীরে। গাড়ি চালাতে কষ্ট হবে। অথর্ব হয়ে পড়ার আগেই জুরিখ ছেড়ে পালাতে হবে যে করেই হোক। তারপর প্রথম কাজ হবে ডাক্তার দেখানো।

গাড়িটা বোর্ডিংহাউজের ঠিক সামনেই পার্ক করা। বিশাল একটা সেডান, দামি এবং নতুন। এদিকের রাস্তায় এ ধরনের গাড়ি কমই দেখা যায়। রেডিওর অ্যান্টেনা দেখেই গাড়িটা চিনে নিল ও। পরীক্ষা করে দেখল কোন অ্যালার্ম সিস্টেম আছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলল, নাহ্! অ্যালার্ম বেজে উঠল না। ড্রাইভার্স সীটে উঠে বসে ভেতরটা পরীক্ষা করে নিল। বাহ্! অটোমেটিক শিফ্ট—তারমানে চালাতে সুবিধা হবে। বেল্টে গুঁজে রাখা সাইলেন্সারওয়ালা পিস্তলটা কোমরে খোঁচা দিচ্ছে, খুলে নিয়ে পাশের সীটে রেখ দিল অ্যালেক্স। তারপর ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল।

নাহ্। ভুল চাবি। গাড়ি স্টার্ট নিল না। একে একে বাকি দুটো চাবি দিয়ে চেষ্টা করার পরেও কাজ হল না। ব্যাপারটা কি?

ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁ দিকে শক্তিশালী আলো জ্বলে উঠল, মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল অ্যালেক্স। সহজাত প্রবৃত্তি বশে পাশের সীটে রাখা পিস্তলটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে ডানদিকেও আলো জ্বলে উঠেছে, সেদিকের দরজা খুলে গেল। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড শক্তিতে ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে কেউ মারল ওর ডান হাতের কব্জিতে, আর একটা হাত তুলে নিল পিস্তলটা।

'বেরিয়ে এসো!' বাঁ দিক থেকে ইংরেজিতে কেউ আদেশ করল, গলার ওপর চেপে বসেছে আগ্নেয়াস্ত্রের ঠাণ্ডা নল।

ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়াল অ্যালেক্স, চোখে এখনও লক্ষ তারার ফুলঝুরি। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে দৃষ্টি। ঝাপসা থেকে ধীরে

ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল সোনালী একজোড়া চশমা। চিনতে একটুও অসুবিধা হল না, সারাদিন এই লোকই ওকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

'পদার্থবিদ্যার নীতি অনুসারে সব ক্রিয়ারই একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে,' মিটিমিটি হাসছে চশমাধারী, 'ঠিক সেভাবে তোমার ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করে নিতে আমাদের একটুও অসুবিধা হয়নি। অনেক চিন্তাভাবনা করে তোমার জন্যে ফাঁদটা পাতা হয়েছিল। বোকার মত তাতে পা দিয়েছ।'

'ওপরের ছেলে দুটোর জন্যে ঝুঁকি একটু বেশিই নিয়েছ,' শান্ত স্বরে বলল অ্যালেক্স।

'ওদেরকে প্রচুর পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সবাই জানে নেহায়াত দরকার না পড়লে কাউকে প্রাণে মারো না তুমি। মেরে ফেললেই বা ক্ষতি কি, তোমাকে তো কব্জা করেছি।'

'না, ওরা বেঁচে আছে, তবে ব্যথা পেয়েছে,' চোখ কুঁচকে উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে অ্যালেক্স।

এসময় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল অ্যালেক্স—আরে, এ যে মিশেল ডিয়ন!

'এই সেই লোক,' একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে মিশেল।

'ওহ্, মাই গড...' অবিশ্বাস ভরা চোখে মাথা ঝাঁকাচ্ছে অ্যালেক্স, 'তুমি এদের লোক! কিন্তু কেমন করে তা হয়! ক্যারিলন দ্যু লাকে আমিই তো তোমাকে বেছে নিয়েছিলাম...নাকি বেছে নেয়ার অপেক্ষায় আশেপাশে ঘুরঘুর করছিলে! আশ্চর্য! অথচ একটু আগে রাস্তায় পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিলে!'

'অবশেষে সে কাজটায় সফল হয়েছি। এরা পুলিশের লোক,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মিশেল।

বিভ্রান্ত হয়ে চশমাধারীর দিকে তাকাল, পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল অ্যালেক্স, 'অভিনয় প্রতিভাও আছে দেখছি!'

'এই যৎসামান্য,' আত্মপ্রসাদের হাসি লোকটার ঠোঁটে। 'অবশেষে তাহলে সত্যিই তোমার চেহারাটা দেখার সৌভাগ্য হল! গত দু'তিন বছরে তোমার চেহারা নিয়ে কম জল্পনা-কল্পনা হয়নি। কত রকমের গুজব যে ছড়িয়েছে! একটা বর্ণনার সঙ্গে অন্যটার কোন মিলই নেই। কেউ বলে লম্বা, কেউ বলে মাঝারি। কেউ বলে সোনালী চুল, কেউ বলে কালো। কেউ বলে তোমার চোখ নীল, কারও মতে কালো, আবার কেউ বলে সবুজ।'

শুনতে শুনতে অ্যালেক্সের মনে হল ডাক্তার টুক্সবেরী ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। ছদ্মবেশের কারণেই কসমেটিক সার্জারির সাহায্যে ওর জন্মগত চেহারায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু, কেন?

'রাত হয়েছে, আমাকে হোটেলে ফিরতে হবে,' এগিয়ে এল মিশেল অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে, 'কোথাও সই-টই করার দরকার হলে আমাকে হোটেলেই পাবেন কাল সকালে।'

সোনালী-ফ্রেমের চশমার ওপাশে চোখজোড়া একটু নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিশেলের পেছনে দাঁড়ানো মোটাসোটা লোকটা ওর বাহু চেপে ধরল। অবাক হয়ে এর-ওর মুখের দিকে চাইল মিশেল, পর মুহূর্তেই আতঙ্ক ফুটে উঠল বড় বড় চোখ জোড়ায়।

'ওকে যেতে দাও,' অ্যালেক্স বলে উঠল, 'মেয়েটা বিদেশী, কেনেডিয়ান। দু'একদিনের মধ্যেই অটোয়ায় ফিরবে, তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

'বোকার মত কথা বলো না, কেইন। ও আমাদের দেখে ফেলেছে। আমরা প্রফেশনাল, নিয়ম মেনে চলতে হয়।' চশমাধারী পিস্তলের নল

চেপে ধরল অ্যালেক্সের চিবুকে, তারপর বাঁ হাতে ওর পকেট হাতড়ে রিভলভারটা বের করে নিল। মোটাসোটা লোকটার উদ্দেশে বলল, 'মেয়েটাকে নিয়ে যাও। লিমাট।'

পাথর হয়ে গেল অ্যালেক্স, মনে হল কেউ যেন খামচে ধরেছে কলজেটা। মিশেলকে হত্যা করবে এরা! লিমাট নদীতে ফেলে দেবে দেহটা!

'দাঁড়াও!' এক পা এগুলো অ্যালেক্স, সঙ্গে সঙ্গে গলার ওপর চেপে বসা পিস্তলটার চাপে আবার ফিরে যেতে হল গাড়ির হুডের ওপর। 'বোকামি কোরো না, মেয়েটা কেনেডিয়ান সরকারের চাকুরে। ওর কিছু হলে জুরিখ তোলপাড় করে ফেলবে কেনেডিয়ান সরকার।'

'তাতে তোমার কি? তোমাকে তো ওরা খুঁজে পাবে না!'

'অকারণ হত্যা আমি ঘৃণা করি,' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে অ্যালেক্স, 'আমরা প্রফেশনাল, ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'রাখো তোমার লেকচার!' বিরক্ত হয়ে চশমাধারী স্থানীয় ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল সঙ্গীকে।

'চ্যাঁচাও!' মিশেলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল অ্যালেক্স, 'যত জোরে পারো চ্যাঁচাও! গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাও! থামবে না!'

চ্যাঁচাতে শুরু করল মিশেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই গলার ওপর ঘুসি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। মোটা লোকটা ওকে হেঁচড়ে নিয়ে তুলল কালো একটা সেডানে।

অসহায়ের মত চেয়ে রইল অ্যালেক্স, মনে হচ্ছে এইমাত্র যেন কেউ ওর ডান হাতটা কেটে নিয়েছে। এমন লাগছে কেন? অল্প ক'ঘন্টার পরিচয়, মেয়েটা কখন ওর হৃদয়ের গভীরে নিজের জায়গা করে নিল? অপসৃয়মান কালো সেডানের বাম্পারে চোখ রেখে অসুস্থ বোধ

করল অ্যালেক্স।

'ব্যাঙ্কে তোমাদের লোক আছে, নিশ্চয়ই জানো আমি বেশ ধনী লোক,' শেষ চেষ্টা করল অ্যালেক্স, 'পুরো টাকাটা তোমাকে দিয়ে দেব, শুধু মেয়েটাকে ছেড়ে দাও।'

'বোকা নাকি! সম্পদ ভোগ করার জন্যে সময়ের দরকার। ওই টাকার একটা ফ্রাঁ-ও যদি স্পর্শ করি, পাঁচ মিনিটের বেশি আমি বেঁচে থাকব না,' হেসে উঠল সে। তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'ওকে গাড়িতে তোলো। পরনের পোশাক খুলে নেবে। ন্যাংটো করে বেশকিছু ছবি তুলবে, আগে-পরে দু'রকমেরই।' অ্যালেক্সের দিকে চেয়ে বলল, 'প্রথম প্রিন্টটা যাবে লুকার কাছে। বাকিগুলো পত্রিকার লোকেরা কিনে নেবে চড়া দামে।'

'লুকা কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করবে? তুমিই তো বলেছ আমি দেখতে কেমন কেউ তা জানে না।'

'সেটা কোন ব্যাপারই না। গেমেইনশ্যাফট ব্যাঙ্কের দু'জন কর্মকর্তা তোমার মৃতদেহকে ''অ্যালেকজান্ডার কেইন''-এর দেহ হিসেবে সনাক্ত করবে। আর কোন কথা নয়, প্রচুর কাজ পড়ে আছে। কেভিন, তুমি এদিকটা সামলাও।' বলতেই বোর্ডিংহাউসে ঢুকল কেভিন।

পেছন থেকে কেউ হ্যামারলকে আঁকড়ে ধরল ওর গলা, মেরুদণ্ডে চেপে বসেছে পিস্তলের নল। টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে ওঠানো হল ওকে। বল প্রয়োগ করার কোন সুযোগই পেল না কেইন। এরা সব প্রফেশনাল। সোনালী চশমাধারী উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে।

'ওর আঙুলগুলো ভেঙে দাও,' আদেশ করল সে।

গলার ওপর চেপে বসা হাতটা আর একটু শক্ত হল, আঙুলের

ওপর উপর্যুপরি আছড়ে পড়ছে পিস্তলের শক্ত বাঁট। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল অ্যালেক্স, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ওর মধ্যেই বাঁ হাতে ডান হাতের আঙুলগুলো ঢেকে দিল আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

ঠিক এক মিনিট পর থামল লোকটা। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে হাতের পাঞ্জা দুটো। দেখে বোঝার উপায় নেই ডান হাতটা পুরোপুরি অক্ষত আছে। অ্যালেক্স তখনও আর্তনাদ করে যাচ্ছে।

চলতে শুরু করল গাড়িটা স্টেপডেকস্ট্রাসে ধরে। পেছনের সীটে অ্যালেক্স শ্বাস নেবার জন্যে ছটফট করছে, থরথর করে কাঁপছে গোটা শরীর। গলার বাঁধনটা একটু আলগা হল, একটানে লোকটা ওর শার্ট ছিঁড়ে ফেলল, প্যান্টের বেল্ট ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। আর সময় নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সবকিছু কেড়ে নেবে এরা, জুরিখ থেকে বেরুবার সব পথ যাবে বন্ধ হয়ে! আবার চেঁচিয়ে উঠল অ্যালেক্স।

'পা! উঃ! আমার পা!' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল অ্যালেক্স, ব্যথায় চ্যাঁচাচ্ছে। এদিকে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ডান হাতটা, মোজার মধ্যে গোঁজা অটোমেটিকের বাঁটে পৌঁছে গেছে।

'সাবধান!' সামনে বসা চশমাধারী ওর সঙ্গীকে সতর্ক করতে চাইল। প্রফেশনাল লোক—সে ঠিকই টের পেয়েছে অ্যালেক্সের মতলব।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ডান হাতে অটোমেটিক পিস্তলটা ঘুরিয়ে এনে লোকটার হৃৎপিণ্ডে ঠেকিয়ে ট্রিগার টানল অ্যালেক্স। নিশ্চল হয়ে গেল লোকটা, এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করল অ্যালেক্স। পিস্তলের নলটা চশমাধারীর মাথার পেছনে ঠেকিয়ে আদেশ করল, 'স্পিড কমাও। তারপর খুব ধীরে ধীরে পিস্তলটা পাশের সীটে রাখো।'

স্পিড না কমিয়ে পকেট থেকে সাবধানে পিস্তল বের করে পাশের

খালি সীটে ফেলে দিল চশমাধারী। 'তুমি জুরিখ থেকে বেরুতে চাও, আমি তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। চারদিক ঘিরে ফেলেছে পুলিশ, আমার সাহায্য ছাড়া বেরুতে পারবে না তুমি।'

'দেখা যাবে,' মিথ্যে বলল অ্যালেক্স। একে বিশ্বাস করার চেয়ে একটা সাপকে বিশ্বাস করাও ভাল। 'ব্রেকে পা দাও, স্পিড কমাও,' পিস্তলের নল দিয়ে লোকটার মাথায় খোঁচা দিল।

অ্যাক্সিলেটার থেকে পা তুলে ব্রেকে ঠেকাল সোনালী চশমাওয়ালা। ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে। একদৃষ্টে অ্যালেক্স চেয়ে আছে স্পিডোমিটারের দিকে—এখন শুধু ঠিক সময়টা বেছে নেবার অপেক্ষা।

স্পিডোমিটারের কাঁটা বাঁ দিকে ঘুরছে···ত্রিশ কিলোমিটার··· আঠারো কিলোমিটার···নয় কিলোমিটার। গাড়িটা প্রায় থেমে এসেছে। ঠিক এসময় নড়ে উঠল চশমাওয়ালা।

নির্বিবাদে গুলি করল অ্যালেক্স। মাথার খুলিতে বড় একটা লাল গর্ত নিয়ে স্টিয়ারিঙের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। ঠেলে দেহটা পাশের সীটে গড়িয়ে দিয়েই হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিঙ হুইলটা চেপে ধরল অ্যালেক্স। ফুটপাতে একগাদা আবর্জনা জড়ো করা আছে, গাড়িটা সোজা ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। চশমাওয়ালাকে হত্যা করার জন্যে একটুও অনুশোচনা হচ্ছে না।

চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসছে। ওরা গুলির আওয়াজ পায়নি, পেলে উল্টোদিকে ছুটত।

সীট টপকে সামনে চলে এল অ্যালেক্স। হ্যাঁচকা টান মেরে গিয়ার নিয়ে এল রিভার্সে। লাফ দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে এল আবর্জনার স্তূপ থেকে, গড়িয়ে নেমে এল রাস্তায়। জানালার কাঁচ নামিয়ে ছুটে আসা উদ্বিগ্ন পথচারীদের উদ্দেশ্যে দাঁত বের করে হাসল, 'কিচ্ছু হয়নি! সব

ঠিক আছে! একটু বেশি পান করে ফেলেছিলাম আর কি!'

আগ্রহ হারিয়ে যে যার পথে রওনা হল তারা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অ্যালেক্স। আর একটু কাছে এলেই গাড়ির ভেতরের মৃতদেহ দুটো দেখে ফেলত ওরা। গিয়ার ড্রাইভে নিতে সামনে এগুলো গাড়িটা। জায়গাটা চেনার চেষ্টা করল অ্যালেক্স। কিন্তু মাথাটা কাজ করতে চাইছে না, এখনও অল্প অল্প কাঁপছে শরীরটা।

জার্মান ভাষা জানে না ও, কিন্তু শুনতে ভুল করেনি, মিশেলকে নিয়ে যাবার সময় চশমাওয়ালা 'গিসেন কোয়াই'-এর কথা কিছু বলেছিল। তার একটু আগেই মিশেলের দেহটা লিমাট নদীতে ফেলে দেবার আদেশ করেছে। গিসেন কোয়াই যেখানে লিমাট নদীর সঙ্গে মিলেছে, সে জায়গাটা ওর চেনা। লেক জুরিখের ঠিক মুখেই, পশ্চিমে। একটা বড় পার্কিংলট আছে। এ ধরনের কাজের জন্যে আদর্শ জায়গা। মেয়েটা কি এখনও বেঁচে আছে? হুহু করে উঠল বুকের ভেতরটা। মেয়েটার এই পরিণতির জন্যে নিজেকেই দায়ী করছে ও। যদিও গাড়ির ভেতর মড়া দুটোকে বয়ে বেড়ানো বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার, তবুও শেষ চেষ্টা করতেই হবে।

অন্ধকার এক গলিতে ঢুকে গাড়ি থামাল অ্যালেক্স, একে একে মড়া দুটোকে নামিয়ে দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি হেলান দিয়ে বসাল।

ঠিক দু'মিনিট পর হাইওয়ে ধরে ঝড়ের গতিতে গিসেন কোয়াই আর লিমাট নদীর সঙ্গমের উদ্দেশ্যে রওনা হল অ্যালেক্স। খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে কি?

নয়

লাল আলো জ্বলে উঠতে ইন্টারসেকশনে থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হল। বাঁ দিকে রাতের আকাশের গায়ে রামধনুর মত বাঁকা এক সারি আলো। ব্রিজ! লিমাট নদীর ওপরের ব্রিজ! চলে এসেছে ও গন্তব্যে। সবুজ বাতি জ্বলতেই বাঁ দিকে বাঁক নিল অ্যালেক্স। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

ব্যানহফস্ট্রাসেতে আছে ও, মিনিট খানেকের মধ্যেই গিসেন কোয়াইতে উঠল। বাঁ দিকে নদীর ধার ঘেঁষে পার্ক। এই শীতের রাতে পার্ক ফাঁকা, অথচ গ্রীষ্মে অনেক রাত পর্যন্ত লোকজন থাকে। পার্কে ঢোকার রাস্তাটা মোটা চেন দিয়ে বন্ধ করা। আর একটু এগিয়ে পরের রাস্তাটার সামনে এসে থামল অ্যালেক্স। এটাও চেন দিয়ে বন্ধ করা, তবে টায়ারের ছাপ কংক্রিটে স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। ড্যাশবোর্ড থেকে চশমাওয়ালার ফ্ল্যাশ-লাইটটা বের করে ছাপগুলো পরীক্ষা করল অ্যালেক্স। কোন সন্দেহ নেই ছাপগুলো একদম টাটকা।

বাঁ হাতের টনটনে ব্যথাটা হঠাৎ করেই যেন বেড়ে গেল, কপালের পাশের ক্ষতটা থেকেও রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। না, এসময় শারীরিক যন্ত্রণার কথা মাথা থেকে দূর করে দিতে হবে। ছেঁড়া শার্টটার নিচের দিক থেকে এক ফালি কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে রক্তাক্ত বাঁ হাতটা ব্যান্ডেজ

করে ফেলল—ব্যস্, অ্যালেক্স একদম তৈরি।

চশমাধারীর পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল। ক্লিপ ভর্তি বুলেট, একটাও খরচ করা হয়নি। সন্তুষ্ট হয়ে গাড়ি থেকে নেমে একটুও শব্দ না করে ভারি চেনটা হুক থেকে খুলে দিল। তারপর হেডলাইট বন্ধ করে অতি ধীর গতিতে গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল পার্কিংলটে। দু'শো গজ দূরে চিকচিক করছে লিমাট নদীর কালো জল, ঢেউয়ের মাথায় দুলছে ঝলমলে বোটগুলো। নদীর অপর পারে পুরানো শহরের অলোকসজ্জা অপেক্ষাকৃত ম্লান। স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। ঠিক এখানেই লিমাট লেক-জুরিখে মিশেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে নজর বুলাল। ডান দিকটা একটু বেশি অন্ধকার ঠেকছে না? কালো একটা ছায়া। সম্ভবত একটা গাড়ি।

ইঞ্জিন বন্ধ করল অ্যালেক্স। হুহু করে বাতাস বইছে, সঙ্গে নদীর কুলুকুলু গর্জন। ওরা ইঞ্জিনের শব্দ পায়নি, অতদূর থেকে শুনতে পাবার প্রশ্নই ওঠে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে অ্যালেক্স, সজাগ পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

মেয়েলি কণ্ঠের চিৎকার। মাঝপথেই থেমে গেল, স্পষ্ট শোনা গেল পরপর দু'বার চপেটাঘাতের শব্দ। আবার ভাঙা ভাঙা আর্তনাদ।

নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল অ্যালেক্স, ডান হাতে পিস্তল, রক্তাক্ত বাঁ হাতে ফ্ল্যাশলাইটটা কোনমতে ধরে আছে। বিড়ালের মত নিঃশব্দে জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে এগুলো।

চাঁদের আলোয় চিকচিক করে উঠল কালো সেডানের ধাতব বাম্পার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অ্যালেক্স, চিনতে পেরেছে গাড়িটা। তারমানে বেঁচে আছে মেয়েটা এখনও।

চপেটাঘাত আর ভাঙা ভাঙা চিৎকারটা এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

গাড়িটার ভেতর থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ আসছে!

যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ে দৌড়াল অ্যালেক্স। ট্রাঙ্কের পেছন দিয়ে ঘুরে সামনের জানালায় পৌঁছেই জ্বালিয়ে দিল ফ্ল্যাশলাইট, একই সঙ্গে যতটা সম্ভব ভড়কে দেবার উদ্দেশ্যে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'নড়লেই গুলি খাবে!'

ভেতরের দৃশ্য দেখে রাগে দুঃখে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। প্রায়-উলঙ্গ মিশেল ডিয়ন দু'হাতে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে, ওর ছিন্নভিন্ন সমুদ্র-নীল পোশাকটার ছেঁড়া অংশগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারদিকে। আক্রমণকারী হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওর দেহের ওপর।

'বেরিয়ে আয়, শুয়োরের বাচ্চা!' জমাট বাঁধা কান্নাটা গিলে ফেলে ধমকে উঠল অ্যালেক্স।

বিস্ফোরিত হল কাঁচের জানালাটা। জুতোর হিল দিয়ে লাথি মেরেছে জানালায়। লোকটা বোকা নয়, জানে মেয়েটার নিরাপত্তার খাতিরে গুলি করতে পারবে না অ্যালেক্স। লাফিয়ে উঠে চোখ ঢেকে দু'পা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল অ্যালেক্স, ভাঙা কাঁচের কণায় ঢেকে গেছে মাথার চুল।

হাট হয়ে খুলে গেল দরজা, নীলচে আগুনের ফুলকি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ডান বাহুতে গুলি খেল অ্যালেক্স। ব্যথায় অবশ হয়ে গেল শরীরের ডান দিকটা, অন্ধকার নেমে এল দু'চোখে। আবছা ভাবে ধাবমান আকৃতিটা দেখতে পেল চোখের কোণে, আন্দাজে ট্রিগার টানল। কিন্তু লক্ষ্য ভেদ হল না। দ্বিতীয়বার গুলি করল অ্যালেক্স, এবারেও শুধু অ্যাসফল্টের চলটা উড়ল। অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে লোকটা।

যে কোন মুহূর্তে ঘুরে আবার গুলি করতে পারে লোকটা। বহু কষ্টে

গড়িয়ে গড়িয়ে খোলা দরজাটার আড়ালে চলে এল অ্যালেক্স। মিশেলের উদ্দেশ্যে চ্যাঁচাল, 'ভেতরে থাকো! বেরিও না!' ভীত-আতঙ্কিত মেয়েটা ওর কথা শুনতে পেলেও বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না, সমানে চিৎকার করছে আর অ্যালেক্সকে ঠেলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে গাড়ি থেকে। 'গড্যাম ইট! বলছি ভেতরে থাকো!' ধমকে উঠল অ্যালেক্স।

পরপর তিনটে বুলেট আঘাত করল খোলা দরজার গায়ে। পার্কিংলটের শেষপ্রান্তে নদীর ধারের দেয়ালের ওপর দৌড়াচ্ছে আক্রমণকারী। দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল অ্যালেক্স, মৃদু গোঙানির শব্দ শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হল। গুলি খাওয়া শত্রুর শক্তি অনেক কম।

হঠাৎ করেই নদীর ধার ঘেঁষে ছোট্ট একটা খুপরিতে আলো জ্বলে উঠল। নাইট-গার্ড। গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে। স্থানীয় ভাষায় ভেতর থেকে চিৎকার করে কিছু প্রশ্ন করল। আলোকিত খোলা দরজায় দেখা যাচ্ছে লোকটার ছায়া। হাতে জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট।

ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে দেয়ালের গোড়ায় উবু হয়ে বসে থাকা আহত প্রতিপক্ষের। দেখামাত্রই ঝটিতে দাঁড়িয়ে পড়ে গুলি করল অ্যালেক্স। বুড়ো নাইট-গার্ড এবার শব্দ লক্ষ্য করে ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল অ্যালেক্সের দিকে। বসে পড়ল অ্যালেক্স, সঙ্গে সঙ্গে দুটো গুলি এসে লাগল দরজার গায়ে।

পায়ের শব্দ পেল অ্যালেক্স, লোকটা দৌড়াচ্ছে নাইট গার্ডের উদ্দেশ্যে। বুড়োর আর্তচিৎকার শুনতে পেল অ্যালেক্স। নিভে গেল ফ্ল্যাশলাইট। খুপরির ভেতরে জ্বালানো কম পাওয়ারের আলোয় দেখা গেল বুড়োকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা অন্ধকারে। একটু পরেই শোনা গেল গুলির শব্দ আর বুড়ো মানুষটার শেষ আর্তনাদ। পায়ের

শব্দ দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। অ্যালেক্স তখনও বসে বসে হাঁপাচ্ছে। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না, যন্ত্রণায় অবশ হয়ে গেছে পুরো শরীর। ঘুম নেমে আসছে দু'চোখ ভেঙে।

ছেঁড়া কাপড়গুলো দু'হাতে আঁকড়ে ধরে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মিশেল। চোখের জলে লেপটে গেছে মুখের মেকাপ, কাঁপছে বাঁশপাতার মত। চেয়ে আছে অ্যালেক্সের দিকে—সে চোখে একই সঙ্গে খেলা করছে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ভয়।

'পালাও,' ফিসফিসে শব্দ বেরিয়ে এল অ্যালেক্সের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, মেয়েটা ওর কথা বুঝতে পারছে তো? 'পেছনে একটা গাড়ি আছে, ইগনিশনে চাবি আছে···পালাও···লোকটা আবার ফিরে আসতে পারে···' ধীরে ধীরে বুজে এল অ্যালেক্সের কণ্ঠস্বর।

'আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি,' এলোমেলো ভাবে বলে গেল মিশেল, 'আমাকে রক্ষা করার জন্যে ফিরে এসেছ তুমি···আমার সম্মান···আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ!'.

'কথা বলে সময় নষ্ট না করে পালাও···পালাও···' জড়িয়ে গেছে কণ্ঠস্বর, অর্ধেক কথা মিশেল বুঝতেই পারল না।

'তুমি ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছ, কিভাবে তা জানি না। অথচ পালিয়ে না গিয়ে ফিরে এসেছ তুমি আমাকে উদ্ধার করতে!' মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে গেল মিশেল।

অ্যালেক্স তখন তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। বহুকষ্টে চোখটা একটুখানি খুলতেই চমকে উঠল। আরে! মেয়েটা করছে কি! হাঁটু গেড়ে বসে অ্যালেক্সের মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছে, পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর চুলে-গলায়-বুকে। পোশাকের ছেঁড়া টুকরোগুলো দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে গুলি-খাওয়া ক্ষতে। ভেজা গলায় প্রশ্ন করল,

'কেন এলে তুমি? কেন?'

ও কি জানে না এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া অ্যালেক্সের সাধ্যের বাইরে! কিন্তু এদিকে যে সময় বয়ে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে বিপদের সম্ভাবনা। 'আমি তোমার জন্যে আসিনি,' দ্রুত বলে উঠল অ্যালেক্স, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটাকে সরিয়ে দিতে হবে এখান থেকে দূরে। 'লোকটা আমাকে দেখেছে...পরে চিনে ফেলতে পারত...আমি ওর জন্যেই এসেছি। এখন ভাগো এখান থেকে...পালাও...' হাঁপাচ্ছে অ্যালেক্স, আবার অন্ধকার নেমে আসছে দু'চোখে।

'আরও হাফ ডজন লোক তোমাকে দেখেছে, আর শুধু ওরই পিছু ধাওয়া করলে!' রাগের সঙ্গে বলল মিশেল, 'আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করো...দয়া করে বিশ্বাস করো! এখন দৌড়াও... পালিয়ে যাও...ওরা চলে আসবে যে-কোন মুহূর্তে...'

ধীরে ধীরে কোল থেকে অ্যালেক্সের মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রাখল মিশেল। তারপর ওর ছুটন্ত পদশব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। চলে গেল মিশেল? এতক্ষণ ধরে অ্যালেক্স তো সেটাই চাইছিল, অথচ মেয়েটা চলে যাবার পর কেন বুকের ভেতরটা এমন খালি হয়ে গেল? যাক্, ভালই হল, বেঁচে গেল মিশেল। কেউ আর ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল অ্যালেক্স, তারা ভরা আকাশের নিচে শুয়ে রইল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

ইঞ্জিনের মৃদু গর্জনে ঘোরটা হঠাৎ করেই কেটে গেল। গাড়িটা এদিকেই আসছে। কিন্তু কোন উৎসাহ বোধ করল না অ্যালেক্স। ঘুম নেমে এসেছে সারা শরীর জুড়ে, অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কাঁধে কারও স্পর্শ পেল—কে যেন ওকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে।

'ওঠো,' কে যেন বলে উঠল, 'উঠে দাঁড়াও, আমার শক্তিতে কুলাচ্ছে না...'

'ভাগো...' বিরক্ত হয়ে হাতটা ঠেলে দেবার চেষ্টা করল অ্যালেক্স, 'ছেড়ে দাও আমাকে...' কিন্তু ছাড়ল না সে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

'সব ঠিক হয়ে যাবে, কিচ্ছু চিন্তা কোরো না,' কণ্ঠস্বরটা বলে যাচ্ছে, 'পা'টা ওঠাও...হ্যাঁ, আর একটু...এই তো হয়েছে। এবার একটু নিচু হও...হ্যাঁ...এই তো গাড়িতে উঠে বসতে পেরেছ...আর কোন চিন্তা নেই...' পায়ের শব্দ দূরে সরে গেল। শব্দ করে বন্ধ হল গাড়ির দরজা। মৃদু গুঞ্জন তুলে নড়ে উঠল। নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারাল অ্যালেক্স।

কারা যেন কথা বলছে। কাছেই কোথাও। ধীরে ধীরে চোখ খুলল অ্যালেক্স। ঝাপসা থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল চারপাশের দৃশ্য। বড়সড় একটা ঘর, কম্বলের নিচে বিছানায় শুয়ে আছে ও। পায়ের দিকে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কালো ওভার কোট পরা মাঝবয়েসী এক লোক আর একটা মেয়ে...সমুদ্রনীল ছেঁড়াখোঁড়া একটা স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরে আছে...আরে! এযে মিশেল!

লোকটার হাতে চামড়ার তৈরি ডাক্তারী ব্যাগ, ফরাসীতে কথা বলছে ওরা।

'এখন শুধু বিশ্রাম দরকার,' ভদ্রলোক বললেন, 'আট দিন পর সেলাই কাটতে হবে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলে ক্ষতি নেই, কাজটা আপনিই করতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ভদ্রলোক। মিশেল এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল কাঠের তৈরি ভারি দরজাটা। পিছু ফিরে অ্যালেক্সের দিকে চোখ পড়তেই এক দৌড়ে কাছে চলে এল।

'কখন জেগেছ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল অ্যালেক্স।

'তোমার আঘাতগুলো মারাত্মক,' শান্তভাবে কথা বলছে মেয়েটা, 'তবে একটানা বিশ্রাম নিলে হাসপাতালে যাবার দরকার পড়বে না। ওই ভদ্রলোক ডাক্তার···বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই। তোমার পকেটে প্রচুর টাকা ছিল। ওখান থেকেই ডাক্তারের ফি দিয়েছি। লোকটা মুখ খুলবে না, চিন্তা কোরো না।'

'আমরা কোথায়?' কোলা ব্যাঙের মত শোনাল অ্যালেক্সের কণ্ঠস্বর।

'লেনজবার্গ নামের একটা গ্রামে। জুরিখ থেকে বিশ মাইল দূরে। ডাক্তার আনিয়েছি কাছেরই একটা শহর ওহ্‌লেন থেকে। এক সপ্তাহ পর আমরা যদি এখানেই থাকি, ডাক্তার আর একবার এসে তোমাকে দেখে যাবে।'

'কেমন করে···' উঠে বসার চেষ্টা করল অ্যালেক্স, কিন্তু দু'কাঁধ চেপে ধরে ওকে শুইয়ে দিল মেয়েটা, ইঙ্গিতে নিষেধ করল নড়াচড়া করতে।

'কি ঘটেছে বলছি, তবে জানি না তোমার কৌতূহল মেটাতে পারব কিনা।' মিশেলের চোখে কাঠিন্য ফুটে উঠল, 'খুন করার আগে জানোয়ারটা আমাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। বাঁচার কোন আশাই আমি করিনি। স্টেপডেকস্ট্রাসেতে যখন ওরা আমাকে বন্দী করে, তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে চিৎকার করতে বলেছিলে। পরে,

কিভাবে জানি না ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছ মৃত্যুর মুখ থেকে।'

'তোমার জন্যে নয়···ওই ব্যাটার জন্যে ওখানে গিয়েছিলাম···'

'আগেও সেকথা বলেছ তুমি। কিন্তু তখন যা বলেছিলাম এখনও সেই একই কথা বলছি—তুমি মিথ্যে বলছ। তোমাকে মিথ্যেবাদী বলছি না, কিন্তু তোমার ব্যাখ্যা যুক্তিতর্কে মেলে না। পরিসংখ্যান নিয়ে আমার কাজ, মিস্টার কেইন। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার চোখ এড়ায় না। স্টেপডেকস্ট্রাসেতে দু'জন লোক বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকেছিল তোমাকে ধরে আনতে। পরে তুমিই বলেছ ওরা বেঁচে আছে। তাছাড়া গোল্ডেন ব্রিজের ওই মোটা লোকটাও তোমাকে ভাল করেই চেনে। অথচ ওদের সবাইকে বাদ দিয়ে তুমি ওই জানোয়ারটার খোঁজেই এলে? মিস্টার কেইন, তুমি আমার জন্যেই ওখানে গিয়েছিলে। আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি।'

'এখন কি করবে?' হাল ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল অ্যালেক্স।

'অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে না এলে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেবার কথা মনেও আসত না। আমি তোমাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি জুরিখ থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছ, আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'পুলিশের কাছে গেলে না কেন?'

'প্রথমে পুলিশের কাছে যাবারই চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন গেলাম না তা বলতে পারব না। পুলিশের সঙ্গে তোমার যে খুব একটা বন্ধুত্ব নেই তা তো আগে থেকেই জানি। তোমার কোন ক্ষতি হোক তা চাইনি আমি। তুমি আমার কত বড় উপকার করেছ তা

'হয়ত বুঝতে পারছ না। ওই জানোয়ারটা···জানোয়ারটা···' বাঁ হাতে গড়িয়ে পড়া দু'ফোঁটা অশ্রু মুছে নিল মিশেল, 'একটা মেয়ের জীবনে এরচেয়ে ভয়ঙ্কর কোন অভিজ্ঞতা হতে পারে না। কিভাবে তোমার ঋণ শোধ করব জানি না।'

'আমি কেমন লোক তা জানার পরেও?'

'গত ক'ঘণ্টায় তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছি তার সঙ্গে আহত যে লোকটা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিল, তাকে কিছুতেই মেলাতে পারছি না।'

'আমি তোমাকে কিডন্যাপ করেছিলাম। তোমাকে আঘাত করেছি, মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছি।'

'তোমার জায়গায় আমি হলে আমিও তাই করতাম। তোমাকে খুন করার জন্যে ওরা ধাওয়া করছিল, তুমি শুধু নিজের জীবন বাঁচাতে চেয়েছ। আমার ক্ষতি করার ইচ্ছে তোমার ছিল না।'

'আমাকে গাড়িতে তুলে সোজা এখানে চলে এলে?'

'না, প্রায় আধাঘণ্টা গাড়ি চালালাম আর চিন্তা করলাম। আমি হিসেব করে কাজ করি, ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নিই না। পরনের জামা-কাপড়ের যা অবস্থা ছিল তাতে জনসমক্ষে বের হওয়া যেত না। পার্কিংলট থেকে বেরিয়ে নদীর ধার ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা টেলিফোন বুদ পেলাম। আশেপাশে কেউ ছিল না। ওখান থেকেই হোটেলে আমার এক সহকর্মীকে ফোন করলাম।'

'এলিভেটরে যাদেরকে তোমার সঙ্গে দেখেছিলাম, ওদের কাউকে?' মাঝপথে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল অ্যালেক্স।

'না। সেমিনার-রুমে ছুটাছুটির সময় ওরা যদি স্টেজের উপর আমাকে চিনে ফেলে থাকে, সে আশঙ্কায় ওদেরকে এড়িয়ে গেছি। কে

জানে, হয়ত ওরা পুলিশকে আমার নামধাম জানিয়ে দিয়েছে। তাই ফোন করেছি আমার এক বান্ধবীকে, আমরা একসাথেই অটোয়া থেকে এসেছি। ও শুধু আমার সহকর্মীই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একইসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। ওকে বলেছি কেউ আমার খোঁজ করলে বলতে আমি এক বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, সকালের আগে ফিরব না।

'কোন সন্দেহ নেই তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে,' অ্যালেক্সের দু'চোখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠল।

'স্বীকার করছ তো?' অর্থপূর্ণ ভাবে মুচকে হাসল মিশেল, 'ওকে বললাম আমার রুমে গিয়ে কিছু জামা-কাপড়, চিরুনি আর মেকাপ স্যুটকেসে পুরে ওর ঘরে নিয়ে আসতে। পাঁচ মিনিট পর আবার ফোন করব।'

'কোন প্রশ্ন করেনি?'

'আগেই তো বলেছি ও আমার বান্ধবী। ও ভেবেছে আমি সদ্যপরিচিত কোন বন্ধুর সঙ্গে রোমাঞ্চকর কোন ট্রিপে যাচ্ছি। আমি ভাল আছি জেনেই ও সন্তুষ্ট। সব কথাই নির্বিবাদে বিশ্বাস করেছে।'

'তারপর কি হল?'

'পাঁচ মিনিট পর ফোন করার পর ও বলল কথামত সবকিছুই স্যুটকেসে ভরে নিয়ে এসেছে নিজের রুমে।'

'তারমানে তোমার বন্ধুরা পুলিশকে তোমার নাম জানায়নি। জানালে তোমার ঘরে পুলিশ-পাহারা থাকত, বিনা অনুমতিতে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারত না। কিন্তু ক্যারিলন দ্যু লাক তো অনেক দূরে, স্যুটকেসটা কেমন করে সংগ্রহ করলে?'

'খুব সোজা। মোটা সম্মানীর বিনিময়ে স্যুটকেসটা টেলিফোন-

বুদে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করল সে এক অফ-ডিউটি ওয়েটারকে। ট্যাক্সিতে চেপে আধাঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল ছেলেটা।'

'তোমার জামাকাপড়ের অবস্থা দেখে অবাক হয়নি?'

'ছেলেটা আমাকে দেখেনি। সে সুযোগ ওকে দেইনি। ট্রাঙ্কটা খুলে রেখে স্পেয়ার টায়ারের ওপর একটা দশ ফ্রাঁর নোট রেখে দিয়েছিলাম। জানালার কাঁচ তুলে দিয়ে আমি গাড়ির ভেতর বসেছিলাম, তুমি তো অচেতন। ছেলেটা ট্রাঙ্কের ভেতর স্যুটকেসটা রেখে দিয়ে নোটটা নিয়ে চলে গেল।'

'তুমি শুধু বুদ্ধিমতী নও, জিনিয়াস।' মিশেলকে যতই দেখছে ততই বিস্মিত হচ্ছে অ্যালেক্স। সৌন্দর্য আর বুদ্ধিমত্তার এমন অপূর্ব সমন্বয়! 'কিন্তু ডাক্তারকে জোগাড় করলে কিভাবে?'

'এই বোর্ডিংহাউজের ম্যানেজারই ম্যানেজ করে দিল। তোমার টাকাগুলো কাজ দিয়েছে। স্কুলে পড়ার সময় ফার্স্ট এইডের ট্রেনিঙ নিয়েছিলাম। সেই জ্ঞান অনুযায়ী রক্তপাত কমিয়ে আনার জন্যে তোমার পরনের পোশাক খুলে ফেলতে হয়েছিল। তখনই তোমার পকেটের টাকার ভাণ্ডারের সন্ধান পাই। আশাকরি তুমি রাগ করোনি।'

'আশ্চর্য! আমাকে তুমি একটুও ভয় পাচ্ছ না?'

'একটু একটু পাচ্ছি বটে,' মুখ টিপে হাসল মিশেল। 'কিন্তু আমার জন্যে যা করেছ তা অগ্রাহ্য করতে পারছি না।'

'তুমি জানো না দরকার হলে আমি কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারি।'

'তার মানে নিজের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই। গুলি খেয়েছ তুমি, বলতে গেলে চলাফেরায় অক্ষম। তোমার পিস্তলও আমি নিয়ে নিয়েছি। আর, সবচেয়ে বড় কথা, চাদরের নিচে

তোমার গায়ে একটা সুতোও নেই।'

'বলো কি!' চমকে উঠে চাদরের তলায় হাত ঢোকাল অ্যালেক্স।

'সবকিছু ফেলে দিয়েছি, ওগুলো পরার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল। পালাবার চিন্তা মনে ঠাঁই দিয়ো না। চিন্তা করো তো, রাস্তার মাঝখান দিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছ তুমি!' কাঁচভাঙা হাসিতে ভেঙে পড়ল মিশেল, এই প্রথম ওকে হাসতে দেখল অ্যালেক্স। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাজা জুঁই ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েটার দিকে। এই নোঙরা পৃথিবীর কণামাত্র কলুষতাও যাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

যন্ত্রণার কথা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল অ্যালেক্স, সবকিছু ভুলে হো হো করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ক্ষতে জ্বালা করে উঠতেই চেহারাটা আবার কালো হয়ে গেল।

কপালের ওপর থেকে একগোছা চুল সরিয়ে নিয়ে মিশেল পরনের সাদা ব্লাউজটা দেখাল ইঙ্গিতে, 'স্যুটকেসটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতরে বসেই এটা পরে ফেলেছি। এ ঘরটার এক হপ্তার ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছি। হঠাৎ করে শরীর খারাপ হলে ম্যানেজারকে ডাকবে, সে ডাক্তারকে খবর দেবে। এখন সকাল প্রায় ছ'টা বাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে আলো দেখা দেবে। আমি হোটেলে ফিরব দশটার দিকে। বাকি জিনিসপত্র আর এয়ারলাইন টিকেটটা নিয়ে ফিরে আসব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' অ্যালেক্স নড়ে উঠতেই আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ওর কপালে হাত রাখল, 'চিন্তা কোরো না, আমি মুখ খুলব না।'

'কিন্তু গিয়ে যদি দেখো পুলিশ তোমাকে খুঁজছে? তোমাকে চেনে এমন অনেকেই ছিল সেমিনার রুমে।'

সরাসরি অস্বীকার করে বসল ও। 'ঘরের ভেতরটা অন্ধকার ছিল, তাছাড়া মানুষজন ভয়ে ছুটাছুটি করছিল। কারও পক্ষেই একশো ভাগ

নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে ওটা আমিই ছিলাম।'

আপত্তির ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল অ্যালেক্স, 'এখন কিন্তু আর বুদ্ধিমতী মেয়ের মত কথা বলছ না। আমি বলি কি, হোটেলে যাবার দরকার নেই। তোমার বান্ধবীকে ফোন করে বলো বিল মিটিয়ে দিয়ে বাকি জিনিসপত্র যাতে এখানে পৌঁছে দেয়। আমার ওয়ালেট থেকে যত দরকার টাকা নাও। ফার্স্ট ফ্লাইটেই ক্যানাডায় ফিরে যাও। কারও কাছে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মিশেল গভীর চোখে তাকাল, 'খুব একটা মন্দ বলোনি, রীতিমত লোভ হচ্ছে।' কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ভোরের আলো উঁকি দিতে শুরু করেছে মেঘের আড়াল থেকে। হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

হাসল অ্যালেক্স, 'ওদের মুখ থেকেই তো আমার পরিচয় জেনেছ।'

'শোনা কথা বিশ্বাস করি না! নিজের চোখে যা দেখি যা অনুভব করি সেটাই আমার কাছে সত্যি,' চেঁচিয়ে উঠল মিশেল।

'ওরা বলে আমার নাম আলেকজান্ডার টমাস কেইন।'

'ওরা বলে!' বিস্মিত চোখে অ্যালেক্সের দিকে তাকাল মিশেল, 'মানে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করল অ্যালেক্স, 'আমার সম্বন্ধে তুমি যতটুকু জানো আমি তার চেয়ে বেশি জানি না।'

বাদামী দু'চোখে বিস্ময় আরও ঘন হল, দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে অ্যালেক্সের পাশে বিছানায় বসে পড়ল মিশেল। 'কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তাহলে প্রথম থেকে শুনতে হবে তোমাকে।' শূন্যদৃষ্টিতে ছাদের

দিকে চেয়ে রইল অ্যালেক্স, তারপর বলতে শুরু করল, 'আজ থেকে পাঁচ মাস আগে মেডিটেরেনিয়ানের পোর্ট নোয়া দ্বীপে আমার জন্ম হয়...'

জানালার ওপাশে এক সারি পাইন গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ভোরের সতেজ সূর্য। ঘরের কোণে রাখা একমাত্র সোফাটায় পা তুলে আধ-শোয়া হয়ে বসে আছে মিশেল। দু'হাত বুকের ওপর জড়ো করা। লালচে-সোনালী সূর্যরশ্মি খেলা করছে ওর বাদামী চুলে। অ্যালেক্স আগের মতই শুয়ে আছে একই ভঙ্গিতে, একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলায় ক্লান্ত।

'প্রথম থেকেই তুমি বার বার খাপছাড়া কথা বলছিলে,' ফিসফিস করে বলল মিশেল, 'ভেবেছিলাম তুমি মানসিক ভাবে অসুস্থ। ব্যাকোফেনের ওখানে তুমি বলেছিলে নিজের সম্বন্ধে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো না। আমি সত্যিই তোমাকে পাগল ভেবেছিলাম।'

'খুব একটা ভুল করোনি। এটা তো একধরনের পাগলামিই। সুস্থ মানুষের স্মৃতি থাকে, আমার নেই!'

'ব্যাকোফেন তোমাকে খুন করতে গিয়েছিল সেটা তখন কেন আমাকে বলোনি?'

'সময় ছিল না। তাছাড়া দরকারও মনে করিনি।'

'আশ্চর্য! তুমি তো ভারি অদ্ভুত! আমাকে জিম্মি করলে, গুলি করার ভয় দেখালে, দু'একবার মৃদু আঘাত করতেও ছাড়োনি। ভয়ে একেবারে হজম হয়ে গিয়েছিলাম...কিন্তু কি জানো,' জানালার বাইরে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মিশেল, তারপর বলল, 'কেন যেন মনে হচ্ছিল তুমি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করছ। একই সঙ্গে আমাকে

ভয় দেখাচ্ছিলে আবার আমার নিরাপত্তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলে। গোল্ডেন ব্রিজে মোটা লোকটা যখন এগিয়ে আসছিল, তুমি আমাকে মুখ নিচু করে রাখতে বলেছিলে যাতে আমার চেহারা চিনে রাখতে না পারে।'

'তাতে কি হল?'

'তখনই আমার মনে হয়েছিল তুমি পেশাদার খুনী হতে পারো না। পেশাদার খুনীরা জিম্মীর নিরাপত্তার থোড়াই পরোয়া করে।'

'এখনও বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমাকে দয়া করছ,' হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল অ্যালেক্স। এ মেয়েকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতে যাওয়া বৃথা।

'দয়া নয়, শুধু তোমাকে বোঝার চেষ্টা করছি। সোনালী চশমা পরা লোকটাকে পুলিশ ঠাউরে ওর সব কথাই বিশ্বাস করেছিলাম। তুমি নাকি ভয়ঙ্কর এক খুনী, যে কোন মূল্যে তোমাকে ঠেকাতে হবে। ব্যাকোফেনের মৃতদেহ না দেখলে হয়ত লোকটার কথা বিশ্বাস করতাম না। অথচ এখন আমার মনে কোন সন্দেহ নেই তুমি ঠাণ্ডা মাথার কোন খুনী হতেই পারো না, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।'

'ঠাণ্ডা মাথায় একবার চিন্তা করো,' আপত্তির ভঙ্গিতে দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিল অ্যালেক্স। 'আমার প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। ভাড়াটে খুনী আমি, তুমি তার প্রমাণ পেয়েছ। তুমি জানো খুন করার পারিশ্রমিক হিসেবে এনভেলাপ ভর্তি টাকা আসে আমার কাছে। গেমেইনশ্যাফ্‌ট্ ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্টে জমা আছে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন ডলার। কোত্থেকে এল টাকাগুলো?' শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবার ব্যথা শুরু হল, চোখমুখ কুঁচকে অস্ফুটে বলল, 'পালাও, মিশেল! যত তাড়াতাড়ি পারো ক্যানাডায় ফিরে যাও।'

চেয়ার থেকে নেমে দু'হাত শূন্যে তুলে আড়মোড়া ভাঙল মিশেল, তারপর এগিয়ে এসে বসল অ্যালেক্সের পাশে। 'নিজের প্রতি তোমার এত রাগ?'

অ্যালেক্স বুঝল ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। প্রসঙ্গ পাল্টাল সে এবার, 'টাকাগুলো কোথায় রেখেছ?'

'কাবার্ডের ড্রয়ারে। পাসপোর্ট কেসের ভেতরে। ডাক্তারের নাম আর এই ঘরের রিসিটও ওখানে আছে।'

'পাসপোর্টটা নিয়ে এসো তো।'

মিশেল ড্রয়ার খুলে ওটা নিয়ে এসে ওর হাতে দিল, 'ঘর ভাড়া দিয়েছি তিনশো ফ্রাঁ, ডাক্তারের নাম বের করার জন্যে ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়েছি আরও দুশো। ডাক্তারের পারিশ্রমিক সাড়ে চারশো, আমি তার সঙ্গে আরও দেড়শো যোগ করে দিয়েছি। সব মিলে খরচ হয়েছে এগারোশো ফ্রাঁ।'

'আমি কি হিসেব চেয়েছি?' ফ্যাকাসে হাসল অ্যালেক্স।

'তাও জানা থাকা ভাল। কিন্তু এখন কি করবে কিছু ঠিক করেছ?'

'ক্যানাডায় ফিরে যাবার জন্যে তোমাকে টাকা দেব।'

'আমার কথা বলছি না, তুমি কি করবে?'

'যদি সুস্থ বোধ করি, তাহলে ম্যানেজারকে দিয়ে কিছু পোশাক-আশাক কিনে আনাব। একটু বিশ্রাম পেলেই ঠিক হয়ে যাব।' পাসপোর্টের ভেতর থেকে এক গাদা নোট বের করে মিশেলের দিকে এগিয়ে দিল অ্যালেক্স।

'ওখানে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ আছে,' মিশেলের চোখে বিস্ময়।

'তোমার যা ক্ষতি করেছি তার তুলনায় এটা কিছু না।'

টাকা ধরা অ্যালেক্সের হাতটা ঠেলে দিল মিশেল, 'আমার টাকার

দরকার নেই।'

'মানে?'

'ঠিক করেছি তোমাকে সাহায্য করব।'

'এ্যাই...দাঁড়াও...কি বলছ...' ছটফটিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল অ্যালেক্স।

শুকনো ঠোঁটে সুগন্ধি আঙুলের উষ্ণ স্পর্শ পেল অ্যালেক্স। 'প্লীজ, কোন প্রশ্ন নয়। আমি ভীষণ ক্লান্ত।' ধীর পায়ে আবার সোফায় ফিরে গেল মিশেল, হাঁটুমুড়ে উঠে বসল আয়েশ করে।

দশ

কোন ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল তিনটে দিন। এই তিনদিন অ্যালেক্স শুধু ঘুমিয়েছে, খাবার সময় খেয়েছে আর সন্ধ্যার পর মিশেলের সঙ্গে ম্যারাথন আড্ডা দিয়েছে। এই আড্ডার লোভে সন্ধ্যা নামার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে ওর দেহমন। অ্যালেক্স জানে না ওর জীবনে কোন নারীর অস্তিত্ব ছিল কিনা, এ মুহূর্তে মিশেলই ওর সবকিছু। প্রতিদিন একটু একটু করে উন্মোচিত হচ্ছে এ নারীর রহস্য, তারপরেও মনে হচ্ছে যেন এক জীবনে সবটুকু রহস্য ফাঁস হবার নয়।

ক্যালগারির বিশাল এক খামার-বাড়িতে বড় হয়েছে মিশেল। বাবা-মা ফ্রেঞ্চ-কেনেডিয়ান। মিশেলের বাবা যৌবনে রয়াল

কেনেডিয়ান এয়ারফোর্সের পাইলট ছিলেন। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছু জমি কিনে নিজের হাতে গড়ে তোলেন খামার-বাড়ি। এখন তিনি একজন ধনী চাষী। দু'ভাই এক বোনের সঙ্গে মিশেলের শৈশব আর কৈশর কেটেছে বড় আনন্দে। আঠারো বছর বয়সে স্কলারশিপ নিয়ে মিশেল চলে আসে মন্ট্রিয়লের ম্যাক্‌গিল ইউনিভার্সিটিতে। তখন থেকেই সে অভ্যস্ত স্বাধীন জীবনযাপনে, বছরে দু'বার ক্যালগারিতে বাবা-মাকে দেখতে যাওয়া ছাড়া বাকিসময়টা নিজেই নিজের অভিভাবক। মাস্টার্স শেষ করার পর সরকারি চাকরি পেয়ে অটোয়ায় চলে আসে, তারপর থেকে ওখানেই আছে।

এর মধ্যেই অ্যালেক্স মিশেলের উপর নির্ভর করতে শিখে গেছে। বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় ওর সমস্ত আদেশ-অনুরোধ। সকালে উঠেই মিশেল গ্রামের নিউজস্ট্যান্ড থেকে খবরের কাগজ কিনে নিয়ে আসে, সঙ্গে টুকিটাকি সদাই। স্যান্ডউইচের জন্যে রুটি, স্মোক-মিট আর মেয়োনেজ, আরও থাকে গুচ্ছের ফলমূল। প্রথমদিনই চোরাই গাড়িটা দশ মাইল দূরে রেইনাশ নামের এক গ্রামের কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে ট্যাক্সি চেপে বোর্ডিঙে ফিরে এসেছে। মিশেল যতক্ষণ বাইরে থাকে অ্যালেক্স ততক্ষণ ঘুমায়। বুলেটের ক্ষত শুকিয়ে উঠেছে। প্রতিদিন দুপুরে মিশেলের তত্ত্বাবধানে হালকা ব্যায়াম করে, ঘরের ভেতরেই হাঁটাহাঁটি করে। মিশেল রাতে সোফায় ঘুমায়, একটু পরপর উঠে দেখে অ্যালেক্সের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। হাসপাতালেও এত যত্ন জুটত কিনা কে জানে।

গ্রামের রেস্টোরান্ট থেকে মিশেল বারবিকিউ চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, সালাদ আর রুটি কিনে নিয়ে এসেছে। বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে তাই

খাচ্ছিল অ্যালেক্স। মিশেল ওর প্লেট হাতে সোফায় বসে।

'খবরের কাগজ পড়ার সময় কোন ঘটনাগুলো তোমাকে বেশি নাড়া দেয়?' প্রশ্ন করল মিশেল।

'সবকিছুই।' একটু ভেবে আবার বলল, 'কোন স্মৃতি আমার নেই, কিন্তু খবরের তাৎপর্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয় না।'

'যেমন?'

'আজকের কথাই ধরো। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছাপা হয়েছে গ্রীসে আমেরিকান অস্ত্র শিপমেন্টের ঘটনা নিয়ে জাতিসঙ্ঘে বিতর্ক হচ্ছে, ইউরোপের কয়েকটা দেশ প্রতিবাদ জানিয়েছে। এর গুরুত্ব আমার জানা। মেডিটেরেনিয়ান পাওয়ার স্ট্রাগ্‌ল্, মিড ঈস্ট স্পিলওভার—এসবই আমি বুঝি।'

'আর একটা উদাহরণ দাও।'

'আর একটা আর্টিকলে ওয়ারসও-তে বন্ সরকারের লিয়াঁযো অফিসে রাশান তৎপরতার খবর আছে। এখানেও ইস্টার্ন ব্লক-ওয়েস্টার্ন ব্লকের তাৎপর্য আমার জানা।'

'তারমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে,' খাবার শেষ করে মিশেল প্লেটটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'সাধারণ যে কোন লোকেরই তা থাকতে পারে। মনে হয় না কূটনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে, গেমেইনশ্যাফটের টাকার পরিমাণ প্রমাণ করে আমি সরকারি লোক হতেই পারি না।'

'হয়ত, আমি মানছি। তারপরেও তোমার রাজনৈতিক জ্ঞান আছে। তোমার কথামত কয়েকটা ম্যাপ কিনে এনেছি কাল, ওগুলো দেখে কিছু বুঝলে?'

'কিছু কিছু দেশ আর শহরের নাম পরিচিত মনে হয়েছে। রাস্তাঘাট,

দোকানপাট আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। কিছু মানুষের মুখও আমি মনে করতে পারছি। কিন্তু জানি না তারা কারা। কোন ঘটনাই মনে করতে পারছি না।'

'তারমানে অনেক দেশ ঘুরেছ।'

'মনে হয়,' খালি প্লেটটা বিছানায় পায়ের দিকে ঠেলে দিল অ্যালেক্স।

'কি ধরনের যানবাহন ব্যবহার করতে? প্লেন, গাড়ি, ট্রেন?'

একটু চিন্তা করল অ্যালেক্স। তারপর বলল, 'মনে হয় সবকিছুই। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'প্লেন যদি ব্যবহার করে থাকো, তারমানে ঘনঘন দূরপাল্লার যাত্রায় অভ্যস্ত তুমি। কাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে কিছু মনে পড়ে? এয়ারপোর্ট বা হোটেলে কেউ কি দেখা করতে আসত?'

'রাস্তায়...' নিজের অজ্ঞাতেই কথাটা অ্যালেক্সের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'রাস্তায়? কি?' কৌতূহলী হয়ে সামনে ঝুঁকে এল মিশেল।

'রাস্তায় দেখা করত ওরা... ' ডান হাতে কপাল টিপে ধরল অ্যালেক্স, চোখ বন্ধ, 'নির্জন জায়গায়...অন্ধকার গলিতে...'

'রেস্টোরান্ট? ক্যাফে?'

'হ্যাঁ। হোটেলের রুমেও।'

'কোন অফিসের কথা মনে পড়ে না? বিজনেস অফিস?'

'ন...নাহ্! খুব একটা মনে পড়ে না।'

'যাদের সঙ্গে দেখা করতে তারা কি পুরুষ, না মহিলা?'

'সম্ভবত পুরুষ। তবে কয়েকটা নারী-মুখের কথাও মনে পড়ে।'

'কি বিষয়ে কথা হত?'

'জানি না।'

'মনে করার চেষ্টা করো।'

'নির্বাক ছবির মত শুধু মুখগুলোই দেখতে পাই, কোন কথা বা গলার স্বর শুনতে পাই না।'

'মানুষের সঙ্গে যখন দেখা করতে যেতে, তখন নিশ্চয়ই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হত। কিভাবে সেটা করতে?'

'সম্ভবত টেলিফোনে।'

'ক্যারিলন দ্যু লাকের রিসেপশনিস্ট বলেছিল তোমার কাছে টেলিফোন আসত।'

'ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান কর্পোরেশন।'

'তুমি ওখানে চাকরি করতে?'

'জানি না। টেলিফোন গাইডে ওদের নাম্বার নেই।'

'তুমি এ ব্যাপারটাকে যতটা অস্বাভাবিক ভাবছ আসলে মোটেই তা নয়। বড় বড় কম্পানিগুলো অনেক সময় বেনামে আনলিস্টেড কম্পানি খোলে, যাঁদের মাধ্যমে বেচাকেনা করলে পার্টি অযথা দরাদরি করতে পারে না। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এটা প্রতিদিনই হচ্ছে। এমনও তো হতে পারে বড় কোন কম্পানির হয়ে দেশে-বিদেশে কেনা-বেচা করছ তুমি—বলা যায় না, ব্যবসার মালিকও হতে পারো।'

জোরে হেসে উঠল অ্যালেক্স, 'মিশেল, তুমি ভুলে গেছ অ্যাকাউন্টে শুধু টাকা জমা পড়েছে, বিয়োগ হয়নি। কোন ধরনের ব্যবসায় তা হয়? তাছাড়া সমঝোতা না হলে ব্যবসায়ীরা প্রতিপক্ষকে খুন করার পরিকল্পনা নেয় না।'

'আমি তোমার সঙ্গে তিনটে দিন কাটিয়েছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিশেল, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না তুমি একজন ক্রিমিনাল।

বিরাট কোন ভুল হয়ে গেছে...অথবা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।'

'মিশেল, দয়া করে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কোরো না,' বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজল অ্যালেক্স।

ছাদের দিকে তাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে অ্যালেক্স। জানালার বাইরে শেষ রাতের হালকা অন্ধকার, একটু পরেই চতুর্থ দিনের সূর্যটা আকাশ বেয়ে চড়ে বসবে পাইন গাছগুলোর ডগায়। গল্প করতে করতেই মিশেল ঘুমিয়ে পড়েছিল, লাইটটা আর বন্ধ করা হয়নি। সারা রাত অ্যালেক্স এক ফোঁটাও ঘুমায়নি। সকালে মিশেল জুরিখে ফিরে যাবে, ওখান থেকে ক্যানাডায়। অ্যালেক্সকে থাকতে হবে আরও কয়েকদিন, ডাক্তার এসে স্টিচ কাটবে তিন/চার দিন পর। এরপর ও প্যারিসে যাবে। গেমেইনশ্যাফ্‌ট্ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা প্যারিসে ট্রান্সফার করেছে ও, কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। কি যেন আছে প্যারিসে, চুম্বকের মত টানছে ওকে। কেন যেন মনে হচ্ছে ওখানেই পাওয়া যাবে সব প্রশ্নের উত্তর। কে আছে প্যারিসে? লুকা? কে এই লুকা? অ্যালেক্স কেইনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

সোফার দিক থেকে কাপড়ের খসখসে শব্দ ভেসে এল। মাথা ঘুরিয়ে দেখল ঘুম-ভাঙা চোখে মিশেল মাথা তুলে চেয়ে আছে ওর দিকে। অ্যালেক্স তাকাতেই বলল, 'তুমি নিজেকে যা ভাবছ, তুমি তা নও।'

হেসে উঠল অ্যালেক্স, 'তুমি জানো না আমি কি ভাবছি।'

'অবশ্যই জানি।' নীল কম্বল সরিয়ে উঠে বসল মিশেল, 'তোমার চোখেই সবকিছু ভেসে ওঠে। বিশ্বাস করো, ভুল করছ তুমি।'

'গোল্ডেন ব্রিজের মোটা লোকটা, ব্যাকোফেন আর সোনালী চশমাওয়ালার কথা নিজ কানে শুনেছ। এরপরেও তুমি বিশ্বাস করতে বলছ?'

'এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে চলে এসো না। অপেক্ষা করো, মনে করার চেষ্টা করো, হয়ত কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে। অতীতে কি ঘটেছে তা তুমি কিছুই জানো না।'

'প্যারিসে যেতে হবে আমাকে।'

'হ্যাঁ, প্যারিস।' সোফা থেকে নেমে এগিয়ে এল মিশেল। হালকা হলুদ স্যাটিনের নাইটিটা লেপ্টে আছে শরীরের সঙ্গে, চকচক করছে ঝুটো মুক্তোর বোতাম দুটো। বাতাসে মিষ্টি সৌরভ ছড়িয়ে অ্যালেক্সের শিয়রে এসে বসল। ঝুঁকে চুমু খেল ওর কপালে, ফিসফিস করে বলল, আমার জীবন বাঁচানর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে বুকে টেনে নিল অ্যালেক্স। ফুসফুস ভরে জুঁই ফুলের সৌরভ টেনে নিতে নিতে অস্ফুটে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকেও—আমার জীবন বাঁচাবার জন্যে।'

সেরাতে মিশেল আর সোফায় ফিরে গেল না।

ভোরের আলো চোখে পড়তেই জেগে উঠল অ্যালেক্স। সাবধানে ওর বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে মিশেল যাতে ব্যথা না লাগে। চোখে চোখ পড়তেই হাসল। বাঁ কনুইতে ভর দিয়ে একটু উঁচু হল। কথা বলার জন্যে অ্যালেক্স মুখ খুলতেই ওর ঠোঁটে ডান হাতের তর্জনী ছুঁইয়ে থামিয়ে দিল।

'শোনো,' হাসিমুখে বলল মিশেল, 'আমি ক্যানাডায় ফিরে যাচ্ছি না।' অ্যালেক্স আপত্তির ভঙ্গিতে ধড়মড় করে উঠে বসতে যেতেই

ওকে ঠেলে আবার শুইয়ে দিল, 'বাধা দিয়ো না, আগে ভাল করে শোনো আমি কি বলতে চাইছি। ক্যানাডায় ক'দিন পরে ফিরলেও চলবে। আমি তোমার সঙ্গে প্যারিসে যাব।'

'আমাকে সাহায্য করতে চাইছ? ধরো, আমি যদি তোমার সাহায্য না চাই?'

'তোমার মতামতের থোড়াই পরোয়া করি। তাছাড়া আমাকে তোমার দরকার।'

'কেন ভাবছ তোমাকে আমার দরকার? আমি তো সুস্থ হয়ে উঠেছি।'

'তোমার হয়ে অনেক কাজই আমি করতে পারব যা তুমি করতে পারবে না। তাছাড়া আমি কেনেডিয়ান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করি, প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। জুরিখে কনফারেন্সে যোগ দিতে আসাটা বাজে ব্যাপার। আসলে আমি জুরিখে এসেছি কেনেডিয়ান সরকারের গোপন একটা মিশন নিয়ে। যে-কোন সময় কেনেডিয়ান এম্ব্যাসির প্রোটেকশন চাইতে পারব। প্রয়োজনীয় যে-কোন তথ্য খুব সহজেই আমি সংগ্রহ করতে পারি। বুঝতে পারছ তো, আমাকে কতটা দরকার?'

'তুমি বুঝতে পারছ না...'

আবার ওকে বাধা দিল মিশেল, 'কথা দিচ্ছি, তোমার বোঝা হয়ে দাঁড়াব না। তাছাড়া তেমন কোন বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে এম্ব্যাসির প্রোটেকশন নেব, চিন্তা কোরো না।' তখনকার মত আলাপচারিতায় ইতি টেনে মিশেল শুয়ে পড়ল অ্যালেক্সের বুকে মাথা রেখে।

কেটে গেল আরও তিনটে দিন। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও হাসি আর

গল্পে কোন ছেদ পড়ল না। সব চিন্তা স্থগিত রেখে উপভোগ করল ওরা সময়টুকু, আবিষ্কারের আনন্দে বিভোর হয়ে রইল প্রতিটা মুহূর্ত।

মিশেল আজ বাইরে যায়নি। ওর অনুরোধে বোর্ডিঙের ম্যানেজার সকালের নাস্তার সঙ্গে ইংরেজি আর ফরাসী ভাষায় ছাপা দুটো খবরের কাগজ পৌঁছে দিয়েছে ঘরে। খাটের ওপর মুখোমুখি বসে নাস্তা খেতে খেতে সেগুলোই উল্টেপাল্টে দেখছে ওরা।

'নতুন কোন খবর আছে?' ইংরেজি খবরের কাগজে চোখ বুলাতে বুলাতে প্রশ্ন করল অ্যালেক্স, হাতে অরেঞ্জ জুসের গ্লাস।

'গিসান কোয়াইয়ের সেই বুড়ো নাইটগার্ডকে গতকাল কবর দেয়া হয়েছে। পুলিশ এখনও কোন সূত্র পায়নি,' মিশেলের হাতে ফরাসী কাগজ।

'আমারটাতে আর একটু বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পাওয়া রক্ত, বুলেট আর কাপড়ের টুকরো পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে।'

প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল মিশেল, 'চিন্তার কিছু?'

'আমার জন্যে নয়। আমার পোশাকগুলো মার্সেইয়ের এক সস্তা দোকান থেকে কেনা, কোনভাবেই এরা ট্রেস করতে পারবে না। কিন্তু তোমার পোশাক? বিশেষ কোন ডিজাইনার বা নামকরা কোন দোকান থেকে কিনেছিলে?'

'আরে নাহ্! সবই অটোয়ায় তৈরি। আমার পরিচিত এক মহিলা আছে, সেলাইয়ের কাজ করে। সেই আমার সব পোশাক তৈরি করে দেয়, আমি কাপড় কিনে দেই।'

'তার মানে জুরিখের পুলিশ টের পাবে না?'

'মনে হয় না। তাছাড়া কাপড়টা হঙকঙে তৈরি, সেদিক থেকেও

কোন সুবিধা হবে না,' টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে অ্যালেক্সকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল সে।

'হোটেলের দোকান থেকে কিছু কিনেছিলে? ছোট্টখাট্ট কিছু—এই, ধরো—রুমাল, চিউইঙগাম বা সেফটিপিন?'

'না। কেনাকাটা আমার দুচোখের বিষ। তাছাড়া ইউরোপে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম। সাধ করে কে ছিল্ খায়!'

'ভাল। খুব ভাল অভ্যাস,' হাসল অ্যালেক্স। 'তুমি নিশ্চিত তোমার বান্ধবী হোটেল ছাড়ার সময় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি?'

'ডেস্কে কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। তবে এলিভেটরে আমার সঙ্গে যাদেরকে দেখেছিলে তারা জানতে চেয়েছিল আমি কোথায়। ওদের একজন বেলজিয়ান। সেমিনার রুমে অন্ধকার স্টেজে আমাকে দেখতে পেয়েছিল বলে ওর মনে হয়েছিল। আমার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলে সে সন্দেহ কেটে গেছে। আমার ধারণা লোকটা জানে কি কাজ নিয়ে আমি জুরিখে এসেছি। এ কারণে সন্দেহ হলেও মুখ খুলবে না সে!'

ডিম আর টোস্ট শেষ করে কফিতে চুমুক দিল অ্যালেক্স, 'ঠিক কি দায়িত্ব নিয়ে এসেছ? অসুবিধা না থাকলে একটু আভাস দাও।'

'কেনেডিয়ান অর্থনীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সংক্রান্ত একটা তদন্তে এসেছি আমি জুরিখে। ক্যানাডার বড় বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশীরা কিনে নিচ্ছে গোপনে, বেশির ভাগ সময় তা হচ্ছে বেআইনিভাবে। এ ব্যাপারেই কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি আমি এখানে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'বোঝা উচিত। তুমি আমেরিকান, এ ব্যাপারে তোমরাই বেশি স্পর্শকাতর। তুমি কি জানো কতগুলো আমেরিকান ব্যাঙ্ক ওপেকের

নিয়ন্ত্রণাধীন? শতকরা কত ভাগ কারখানা ইউরোপিয়ান আর জাপানীদের হাতে আছে? ইংল্যান্ড, ইটালী আর ফ্রান্স থেকে আসা টাকায় কেনা হচ্ছে হাজার হাজার একর জমি—এব্যাপারগুলো তোমাকে ভাবায় না?'

'ভাবার মত বিষয় কি?'

'বা রে! ভাবনার বিষয় নয়! তোমার দেশ কিনে নিচ্ছে বিদেশীরা—এটা চিন্তার কথা নয়? যুদ্ধে হেরে গেলে কালক্রমে সে ধাক্কা সামলে নেয়া যায়। কিন্তু অর্থনীতির যুদ্ধে হার মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া।'

'যে জন্যে এসেছ সে কাজ হয়েছে?'

'পুরোপুরি নয়,' কফির কাপ টেনে নিল মিশেল। 'টাকার সূত্রটা খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু কারা খাটাচ্ছে তা জানতে পারিনি।' একটু ভেবে নিয়ে যোগ করল, 'ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান এরকমই কোন ছদ্মবেশী কম্পানি হতে পারে। যদি তা হয়, তবে এর রহস্য উদঘাটন করা আমার পক্ষে এমন কোন কঠিন কাজ নয়। অটোয়ায় আমার ওপরওয়ালা খুবই ক্ষমতাবান লোক। আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ওকে ফোন করে সি. এস. শুরু করতে বলতে পারি।'

'সি. এস! সেটা আবার কি?'

'কোভার্ট সার্চ। আমার বিশ্বাস, যদি এ নামে সত্যিই কোন কম্পানি থেকে থাকে, এরিক—আমার বস্—তাদের পরিচয় বের করে ফেলতে পারবে।'

'সত্যি!' উত্তেজিত হয়ে উঠল অ্যালেক্স, 'একটা নাম··· নিদেনপক্ষে একটা ফোন নাম্বার পেলেই আমি ওদেরকে খুঁজে বের করে ফেলব।'

'নিজে সরাসরি না গিয়ে অন্য কারও মাধ্যমে তা করলেই ভাল করবে। তোমার হয়ে আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।'

'কেন? আমি গেলে কি হবে?'

'তোমাকে সাবধান হতে হবে। ওরা যদি বন্ধু না হয়?'

'কেন তুমি ভাবছ ওরা আমার শত্রু?'

'ভুলে গেছ গত ছ'মাস ওরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগের কোন চেষ্টা করেনি,' গম্ভীর মুখে বলল মিশেল, কফির খালি কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

'কে জানে, হয়ত করেছে। ওরা তো জানে না আমি কোথায় আছি।'

'কিন্তু তাহলে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের টাকাগুলো কেন ওভাবেই পড়ে থাকল? এতগুলো টাকা! তুমি নিখোঁজ, অথচ ওরা টাকাগুলোর ব্যাপারে একটুও মাথা ঘামাল না! এ ব্যাপারটাই আমি বুঝতে পারছি না।'

মাথা নিচু করে হাতের ব্যান্ডেজটা খুঁটছে অ্যালেক্স, মিশেলের কথা উড়িয়ে দিতে পারছে না বলে রাগ হচ্ছে নিজের ওপরেই। খানিক পরে মাথা তুলে মিশেলের দিকে তাকাল, 'তার মানে তুমি ভাবছ ম্যারিটাইম ওয়ান-ও-ওয়ান জানত আমি গায়েব হয়ে যাব—অন্য কথায়, ওদের ইচ্ছেমতই ঘটেছে সবকিছু?'

'হয়ত।' চোখ কুঁচকে চিন্তা করছে মিশেল, 'হয়ত ওদের সঙ্গে তোমার বনিবনা হচ্ছিল না। হয়ত কোন অপরাধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলে। এমনও হতে পারে ওদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছিলে তুমি—কতকিছুই তো ঘটতে পারে!'

'তারমানে এরিক ম্যারিটাইমের হদিস পেলেও আমি যে তিমিরে

সেই তিমিরেই রয়ে যাব। কারা আমাকে খুন করতে চাইছে কেন খুন করতে চাইছে কিছু বুঝতে পারছি না। গোল্ডেন ব্রিজের সেই লোকটা বলছিল ইন্টারপল আমাকে খুঁজছে। ধরা পড়লেও নিজের স্বপক্ষে বলার মত কিছুই থাকবে না আমার, কারণ কি অপরাধ করেছি সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও আমার নেই।'

হাঁটু গেড়ে সামনে ঝুঁকে অ্যালেক্সের হাত দুটো কোলে তুলে নিল মিশেল। 'নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, অ্যালেক্স,' পরম আদরে বলল, 'তুমি কোন অপরাধ করতে পারো না।'

ম্লান হেসে খাট থেকে নেমে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল অ্যালেক্স। পায়ের ব্যথা সেরে গেছে, হাঁটতে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বাঁ হাতের পাঞ্জায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, তবে শুকিয়ে গেছে ক্ষতগুলো। ভাগ্য ভাল, কোন হাড় ভাঙেনি। গুলি খাওয়া জায়গাগুলোও শুকিয়ে এসেছে। মিশেল গতকাল ডাক্তারকে ফোন করেছিল, আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে কোন এক সময় এসে সেলাই কেটে দিয়ে যাবে!

'প্যারিস,' পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই বলে উঠল অ্যালেক্স, 'প্যারিসেই আছে সব রহস্যের চাবিকাঠি। কিন্তু কোত্থেকে যে শুরু করব কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি পাগলই হয়ে যাব!'

'আগামীকালই আমি এরিককে ফোন করতে পারি, তারপর আমরা প্যারিসে চলে যাব।'

'কেন বুঝতে পারছ না এরিক ম্যারিটাইমের পরিচয় বের করে ফেলতে পারলেও আমার তাতে কোন লাভ হবে না। আমি যা জানতে চাই কে আমাকে তা জানাবে? কে আমাকে বলে দেবে কেন ওরা আমাকে হত্যা করতে চাইছে? লুকা...লুকা নামের এক লোক কেন

আমার মৃতদেহের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছে?'

নিমেষে মিশেলের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল, অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি।...কি বললে তুমি!'

'বলছিলাম কত প্রশ্ন যে মাথায় আসে...'

'না, নামটা! তুমি এইমাত্র লুকার নাম উচ্চারণ করেছ!'

'হ্যাঁ,' অবাক হয়ে মিশেলের দিকে চাইল অ্যালেক্স, 'তাতে কি হয়েছে?'

'এই ক'টা দিন সর্বক্ষণ আমরা একসঙ্গে আছি...পোর্ট নোয়ায় জ্ঞান ফিরে পাবার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব খুঁটিনাটি আমাকে বলেছ তুমি, অথচ লুকার নামটা একবারও উচ্চারণ করোনি! যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে নামটা!'

'না, সচেতন ভাবে তা করিনি।' উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠল অ্যালেক্সের দু'চোখ, 'নিজের অজান্তেই নামটা এড়িয়ে গেছি! কিন্তু মনে হচ্ছে নামটা তোমার পরিচিত। মিশেল, কে এই লুকা?'

'তুমি কি ঠাট্টা করছ?'

'আশ্চর্য! ঠাট্টা করব কেন? ঠাট্টা করার মত অবস্থা আমার নয়, কেন বুঝতে পারছ না? মিশেল, লুকা কে?'

'তুমি সত্যিই জানো না! হায় ঈশ্বর!' দু'হাতে মুখ ঢাকল মিশেল।

শক্ত হাতে মিশেলের কাঁধ আঁকড়ে ধরল অ্যালেক্স, মৃদু ঝাঁকুনি দিল, 'মিশেল, কে এই লুকা?'

'পেশাদার খুনী। ওকে "ইউরোপের আতঙ্ক" বলা হয়। গত বিশ বছর ধরে শুধু ইউরোপে নয়, এশিয়া, নর্থ আমেরিকা আর আফ্রিকায় পঞ্চাশ থেকে ষাটজন সামরিক এবং বেসামরিক রাজনৈতিক নেতা আর উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিকে খুন করেছে সে। কেউ জানে না ও দেখতে কেমন...তবে প্যারিসেই ওর আস্তানা।'

ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল অ্যালেক্সের হাত-পা।

পরদিন ডাক্তার এসে সেলাই কেটে ক্ষতস্থানগুলোতে পাতলা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। বিকেলে বোর্ডিঙের ম্যানেজারের মেয়ে-জামাইয়ের ট্যাক্সিতে চেপে বার্ন এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হল ওরা। গতকালের পর থেকে ওরা দু'জনেই গম্ভীর; নেহায়েত দরকার না-পড়লে কথাবার্তা বলছে না।

'এখনও সময় আছে, মিশেল, ক্যানাডায় ফিরে যাও,' নীরবতা ভাঙল অ্যালেক্স।

জানালার বাইরে দ্রুত অপসৃয়মান গাছপালা দেখতে দেখতে মিশেল বলল, 'তোমাকে তো কথা দিয়েছি ক'দিন পরেই ফিরে যাব। কিন্তু তার আগে প্যারিসে ক'দিন বেড়িয়ে যেতে চাই।'

'প্যারিসে না গেলেও তোমার চলবে। তার চেয়ে অটোয়ায় ফিরে গিয়ে আমার একটু উপকার করো—আর কাউকে না জানিয়ে তুমি নিজেই ম্যারিটাইমের খোঁজখবর করতে পারো।'

'তুমিই তো বলেছ ওটা তেমন জরুরি কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, বলেছি। কারণ লুকাকে খুঁজে বের করলেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব। সেজন্যেই আমি প্যারিসে যাচ্ছি।'

মাথা ঘুরিয়ে অ্যালেক্সের চোখে চোখ রাখল মিশেল, 'কিন্তু কোথায় খুঁজবে তাকে? কোত্থেকে শুরু করবে? তুমি যে কিছুই জানো না! সেজন্যেই আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। কখন কি করতে হবে তোমাকে বলে দেব আমি।'

প্যারিসের দশ মাইল দক্ষিণে আরপাযন গ্রামের পুরানো গির্জার চূড়ায়

ঢঙঢঙ শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া অতি বৃদ্ধ এক গ্রাম্য চাষী সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। পরনে কালো রঙের জীর্ণ ওভারকোট, বাঁ হাতে ঝুলছে ময়লা টুপি, কুঁচকে ঝুলে পড়েছে গলা আর মুখের চামড়া। ভারি কাঠের দরজাটা খুলে গির্জায় ঢুকল, সারি সারি বেঞ্চের মাঝের সরু গলি পেরিয়ে সামনের সারির আসনে বসে পড়ে লম্বা করে শ্বাস নিল। প্রায় মাইল খানেক হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বুড়ো। এই গ্রামের আরও অনেক বৃদ্ধের মত সেও লুকার বেতনভুক অনুচর। লুকা কোন ঝুঁকি নেয় না। যে কোন শক্ত-সমর্থ লোকের চেয়ে ইনফর্মার হিসেবে রোগে-শোকে-জ্বরায় জর্জরিত এই বুড়োরা অনেক বেশি বিশ্বাসী। লুকার বদান্যতায় পৃথিবীর বুকে শেষ ক'টা দিন আরামেই কাটছে ওদের, সঙ্গে আছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তা। লুকা ওদের সবার অভিভাবক। চাকরিতে বহাল থাকা অবস্থায় কারও মৃত্যু হলে মোটা টাকা পৌঁছে যাবে স্ত্রী আর সন্তানদের হাতে—শেষ বয়সে এটাই পরম ভরসা।

আপাদমস্তক কালো আলখাল্লায় ঢাকা তরুণ এক পাদ্রী ডান দিকের ছোট দরজা খুলে উপাসনাঘরে ঢুকল। বুড়োর উদ্দেশ্যে মৃদু মাথা দোলাল। বুড়ো জানে এটাই সিগন্যাল। কোল থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে ধীর পায়ে বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষা স্বীকারোক্তি-কুঠুরির দিকে রওনা হল সে। পাঁচ নাম্বার কুঠুরির পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতরটা অন্ধকার। টিমটিম করে একটা মোমবাতি জ্বলছে, কিন্তু তাতে আঁধার যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে। কালো পর্দার মুখোমুখি কাঠের টুলে বসল বুড়ো, চোখ মেঝেতে নিবদ্ধ। পর্দার ওপাশে হালকা একটা ছায়া, হুডতোলা কালো পাদ্রীর পোশাকে ঢাকা আবছা অবয়ব। বুড়োর কোন ধারণা নেই হুডের নিচের চেহারাটা কেমন।

'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান,' নিচু স্বরে বলল বুড়ো।

'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান,' প্রত্যুত্তরে পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে এল গমগমে কণ্ঠস্বর। 'কেমন আছ, বুড়ো?'

'কবরে এক পা পৌঁছে গেছে,' পরম শ্রদ্ধাভরে বলল বুড়ো, 'তবে আপনার দয়ায় শেষ ক'টা দিন আরামেই কাটছে।'

'ভাল। শেষ বয়সে সেটাই সবচেয়ে বেশি দরকার।' চট্ করে কাজের কথা পাড়ল লুকা, 'জুরিখ থেকে কিছু খবর এসেছে?'

'দশ নাম্বার আর তার সঙ্গের দু'জন মারা গেছে। সম্ভবত আরও একজনকে হারিয়েছি আমরা। একজনের হাত থেঁতলে গেছে, সেরে উঠতে সময় লাগবে। কেইন অদৃশ্য হয়েছে। যতদূর মনে হয় মেয়েটা ওর সঙ্গে আছে।'

'এতসব কেমন করে ঘটল?'

'আরও দুঃসংবাদ আছে। মেয়েটাকে খুন করার জন্যে যাকে পাঠানো হয়েছিল তার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কথা ছিল গিসান কোয়াইতে নিয়ে মেয়েটাকে শেষ করে দেবে সে। কিন্তু এর পরে কি ঘটেছে কেউ জানে না।'

'মেয়েটা বেঁচে আছে, আর তার জায়গায় মরল কিনা নাইটগার্ড! হুঁঃ!' নাক দিয়ে বিরক্তির শব্দ করল লুকা, 'মেয়েটা মনে হয় আগাগোড়া অভিনয় করে গেছে। কেইন হয়ত ওকে কিডন্যাপ করেনি, দু'জনে মিলে ফাঁদ পেতেছিল। যাক্, এখন মন দিয়ে শোনো কি বলছি, সঙ্গে নোটবুক আছে তো?'

কাঁপা হাতে কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবুক আর ভোঁতা পেন্সিল বের করল বুড়ো, 'বলুন।'

'জুরিখে টেলিফোন করো। ওখান থেকে কাউকে প্যারিসে আনাও

যে কেইনকে চিনতে পারবে। গেমেইনশ্যাফ্‌ট্‌ ব্যাঙ্কের হ্যানসেলকে বলবে টেপটা যেন নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দেয়। ওকে বলবে যেন ভিলেজ স্টেশনের পোস্ট অফিস বক্সটা ব্যবহার করে।'

'একটু ধীরে বলুন, প্লিজ,' বাধা দিল বুড়ো, 'বুড়ো আঙুলে আর আগের মত জোর নেই।'

'মাফ করো, বুড়ো,' পর্দার ওপাশে নড়ে উঠল আবছা অবয়ব, 'আমি খুব দুঃখিত, নিজের চিন্তায় তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'না না, ঠিক আছে,' বিব্রত হল বুড়ো, 'বলে যান।'

'সবশেষ নির্দেশ—রু্য মেডেলিনের আশেপাশের কোন একটা বাড়িতে আস্তানা গাড়তে বলো আমাদের ছেলেদেরকে। কেইন এবার ব্যাঙ্কে হানা দেবে। সাবধান! ফস্কায় না যেন।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)